আনন্দ-ভবন

আমার স্বামী-রাজাকে

বাবা

মা

সূচীপত্র

জওহর

কমলা

জওহরলালের চিঠি

অনেকদিন তোমার বইয়ের প্রত্যাশায় ছিলাম, এতদিনে পড়া হল। কোনো-কোনো অংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার পড়েছি। কতোগুলো পাতা আরো অনেকবার পড়বার ইচ্ছা আছে, কিন্তু আপাততঃ বইটা হাতছাড়া না ক'রে উপায় নেই, কারণ অনেকেই পড়তে চাচ্ছেন।

এ-বইয়ের যথাযথ সমালোচনা আমি কেমন ক'রে করি! একে তুমি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্রী, তাতে তুমি আবার এমন সব ঘটনা নিয়ে লিখেছ যা আমাদের বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সেই ইতিহাস থেকে আলাদা ক'রে এদের কেমন ক'রে কল্পনা করবো, সমালোচকের মতো দূর থেকে দেখব কেমন ক'রে! তবু এই অবস্থায়ও যতদূর সম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে আমার বক্তব্য জানাতে চেষ্টা করছি।

বইটি আমার খুব ভালো লেগেছে। ভারি সুখপাঠ্য, মনকে একেবারে নিবিষ্ট ক'রে রাখে। এ-টুকুই কোনো লেখার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নিজের সম্বন্ধে লিখতে ব'সে কৃত্রিম বা আড়ষ্ট না-হওয়া খুব কঠিন। এই বিপদকে তুমি সহজেই এড়াতে পেরেছ, লেখার মধ্যে এমন একটা সহজ সাবলীল গতি এসেছে যে, পাঠকের মন তাতেই খুশি হয়ে ওঠে। লেখার ধরন বরাবরই ভালো, কোথাও কোথাও এত ভালো যে মন ভিজে যায়। বিচ্যুতি একেবারে নেই বলতে পারি না, কিন্তু তাতেও মন বিমুখ হয় না, কারণ বোঝা যায় যে, পালিশ-করা কথার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে না-রেখে

রাজা

আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টাই তুমি করেছ। তোমার পটভূমিকা তেমন বিস্তৃত নয় ব'লে নিন্দা করাও নিরর্থক, কারণ যে ছোট ছবি আঁকতে বসেছে তাকে বড় ছবি আঁকোনি ব'লে গাল দিলে চলবে কেন। মূলতঃ তোমার বই হচ্ছে আমাদের পরিবারের ইতিহাস, যে-ইতিহাস তুমি ছোট ছোট ঘটনাচিত্রে ফোটাতে চেয়েছ, দীর্ঘ ঐতিহ্য বর্ণনা করতে যাওনি। মনের যে-সব গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায়ই জীবনী ও আত্মজীবনীর প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে, সে-সবের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা না ক'রেও তুমি ভালো করেছ, কারণ তাতে শুধু তোমার উদ্দেশ্যের সীমানাকেই ছাড়িয়ে যাওয়া হত না, নানা সমস্যার জালে জড়িয়ে তুমি হয়তো দিশেহারা হয়ে পড়তে। লেখবার ধাঁচ ও ছাঁচ তুমি ঠিকই নির্বাচন করেছ বলতে হবে।

আমার মনে হয় বইটি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবার অধিকার তোমার আছে, গর্ববোধ করাও অন্যায় নয়। পড়তে পড়তে বারে বারে বোধ করেছি সমস্ত কাহিনী একটি অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় ঢাকা রয়েছে, যেন এক প্রতিকূল ভাগ্য চিরকাল আমাদের পিছুপিছু ধাওয়া ক'রে এসেছে, তারই ছায়া। এটা শুধু তোমার নয় অনেকেরই মনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। বস্তুতপক্ষে যখনই আমরা অতীতের দিকে চোখ ফেরাই, ঘটনার পর ঘটনার স্বপ্ন-স্রোতের দিকে চেয়ে থাকি, তখনই আমাদের মনে এই বেদনার ভাবটি জেগে ওঠে। এটা খুব স্বাভাবিক। তোমার লেখায় কোথাও কোথাও এই প্রতিকূল ভাগ্যের বিরুদ্ধে একটা বেপরোয়া বিদ্রোহের ভাবও মাথা তুলছে, যেমন ধরো তোমার বইয়ের নামের মধ্যেই। এটাই আসল কথা, কারণ আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের মূল্য যদি কিছু থাকে, সে হচ্ছে

কৃষ্ণা

এই যে, বারে বারে ভাগ্যের নিপীড়নকে আমরা অগ্রাহ্য করেছি, তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, প্রত্যুত্তরে যে-দণ্ড পেয়েছি বিনা দ্বিধায় তাকে মেনে নিয়েছি। ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই লড়াই চিরকাল আরম্ভ করেছি আমরাই, ভাগ্য নয়। ভবিষ্যতের জ্ঞান বিধাতা মানুষকে দেননি, তবু বলতে পারি, যখন যা করেছি, পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়েই করেছি। তাই জীবনে অনেক কঠিন আঘাত সইতে হয়েছে, তিক্ততা সইতে হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই তার জন্য প্রস্তুত থাকতে পেরেছি, কোনো বিপর্যয়কে আচমকা আক্রমণে কাবু ক'রে ফেলতে দিইনি। এই সাধনায় কতদূর সিদ্ধিলাভ করেছি সে-বিচারের ভার অবশ্য আমার নয়, এই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কারুরই নয়।

কোথাও কোথাও তোমার লেখা এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে সমগ্র অতীত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বারে বারে, মনের মধ্যে ছবির পর ছবি ভেসে উঠেছে, ফিরে যাওয়ার, ফিরে পাওয়ার এক বিচিত্র আকুলতা আমাকে পেয়ে বসেছে। জানিনা, যারা বাইরের লোক, আমাদের পরিবারকে তেমন ভাবে জানে না, তাদের এই বই প'ড়ে কী মনে হবে। অবশ্য আমাদের চারদিকের অসংখ্য নরনারীর স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ উৎসুক দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ রয়েছে, আমাদের কাহিনী জানবার জন্য তোমার বই সম্বন্ধেও তাঁদের উৎসাহ জাগ্রত হবে। তা ছাড়া তোমার কাহিনী দেশব্যাপী অসংখ্য নরনারীর সংগ্রামের প্রতীকের মতো বোধ হবে অনেকের কাছে। মামুদের সঙ্গে আমাদের যোগ বহুকালের, তাই তিনি প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে, দরদ দিয়ে তোমার বই পড়েছেন। খানিকটা সমালোচনার দৃষ্টি থেকেও দেখেছেন তোমার কাহিনীকে। বইটা তাঁর খুব ভালো লেগেছে। সেদিন

অজিত ও হর্ষ

কৃষ্ণা

বলছিলেন যে, অনেক জিনিস তুমি এমনভাবে লিখেছ যে কিছুতে ভোলা যায় না। তাঁর বিশ্বাস লেখায় লেগে থাকলে তুমি অল্প-কালের মধ্যেই কথার জগতে ভালো শিল্পী হয়ে উঠতে পারবে। তুমি আনন্দের চেয়ে বেদনার কাহিনী ভালো লেখো, তাঁর মতে সেটাই হচ্ছে ভালো লেখকের লক্ষণ। গভীর রাত্রিতে যখন তিনি বইটা শেষ করলেন তখন তাঁর মন বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছিল, চোখের কোনায় এসে গিয়েছিল জল। প্রিয়জনের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা আমাদের দেশের মেয়েরা উজাড় ক'রে দেয়, তাকে তুমি একেবারে কানায় কানায় প্রকাশ করেছ. এই তাঁর অভিমত।

ভূমিকা

কারো বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে আমি বড় একটা সম্মত হই না, কিন্তু কৃষ্ণার সঙ্গে আমার পরিচয় শৈশব থেকে, কাজেই তার স্মৃতির খাতায় আমার আশীর্বাদের স্বাক্ষরটুকু রেখে যেতে মোটেই আপত্তি করতে পারিনি।

কৃষ্ণার কাছে শুনেছি যে গত বছর অগস্ট মাসে যখন ওদের গোটা পরিবারটাই জেলখানায় চালান হয় তখনকার আশঙ্কাকুল, দীর্ঘ প্রতীক্ষার একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যই ও এই কাহিনী লিখতে শুরু করেছিল।

কৃষ্ণার বয়স এখনো কাঁচা, নিজের তরুণ জীবনের কাহিনী ও স্বভাবসিদ্ধ ঋজুতা ও সারল্যের সঙ্গেই বর্ণনা করেছে। ওর শৈশব কেটেছিল সৌন্দর্যের আর ঐশ্বর্যের আবহাওয়ায়, তার মধ্যে হয়তো বা একটু শৃঙ্খলার অভাব ছিল, কিন্তু সুখ শান্তির অভাব ছিল না। ওর কৈশোর ততো সহজ ভাবে কাটেনি। মহাত্মাজীর প্রভাবে নেহেরু-পরিবারের চালচলন অবিশ্বাস্যভাবে বদলে যায়, কাজেই উৎসবমুখর ঐশ্বর্যের মাঝখান থেকে কৃষ্ণা এসে পড়ে একেবারে কঠিন সংগ্রাম ও আত্মদানের যুদ্ধক্ষেত্রে। আশ্চর্য সারল্যের সঙ্গে কৃষ্ণা এ সমস্তই বর্ণনা ক'রে গেছে। অসুস্থ বৌদিকে নিয়ে ও যখন ছিল সুইজারল্যাণ্ডে, তারপর বাবা ও ভাইর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া ভ্রমণ করেছিল, বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ে ওর মন সমৃদ্ধ হয়েছিল, তখনকার নানান ইতিবৃত্তের টুকরোয় ওর বই উজ্জ্বল। সত্যাগ্রহী বন্দী হিসেবে কৃষ্ণা যখন মেয়েদের জেলে ছিল তখনকার

কাহিনীও এ-বইয়ে আছে, এমন কি ওর বিবাহের ও বিবাহপূর্ব রোমান্সের ইতিহাসও বাদ পড়েনি। হর্ষ ও অজিত—যে ছোট ছোট ছেলেদুটির মুখ চেয়ে ও শেষ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে রাজনীতির আসরে নামতে পারেনি, তাদেরও পাঠকের সামনে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কোথাও কোথাও এই কাহিনী অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে প্রিয়জনের শোকে।

কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়েও এই কাহিনী নেহেরু-পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বৃহৎ পাঠক-সমাজের কাছে এইখানেই এর বিশেষ মূল্য ও আবেদন, কারণ এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধ'রে নেহেরু-পরিবারের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শুধু অচ্ছেদ্য অংশ নয়, মূর্ত প্রতীক হয়ে রয়েছে।

এই সহজ ও ঘরোয়া ইতিবৃত্তের মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে মতিলাল নেহেরুর বিরাট চরিত্র—যেন নতুন আবিষ্কার। তুলনা নেই মতিলালের। তাঁর সবচেয়ে চিত্তজয়ী, সুন্দর রূপটিই এখানে ধরা দিয়েছে—প্রিয়জনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা, গুণমুগ্ধ পরিবারের উপর তাঁর সপ্রেম শাসন। তাঁর অনেক গুণের মধ্যে এই মহৎ গুণটিকে দেখে মহাত্মাজী বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

জওহরলালেরও যে-রূপ এখানে প্রকাশ পেয়েছে সেটা তার যোদ্ধরূপ নয়, এখানে পারিবারিক প্রেমের নানান দিককে ফুটিয়ে তুলতেই সে ব্যগ্র, পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, স্বামীরূপে, বন্ধুরূপে আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী হিসেবে তার ভালোবাসা চারদিকে প্রসারিত হয়েছে।

জওহরলালের স্ত্রী কমলার সকরুণ জীবন ও অকালমৃত্যুর কাহিনী

আজ পৌরাণিক কাহিনীর স্তরে গিয়ে পৌঁছেচে আমাদের দেশে। এই অপরূপ সুন্দরী বীরনারীর মূর্তিকেও কৃষ্ণা গভীর দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে। স্বরূপের নাম এখন বিজয়লক্ষ্মী। রূপোলী একটি জলের ফিতের মতো তার জীবন এ-বইয়ের জমির মধ্য দিয়ে আনাগোনা করেছে। বিবাহরাত্রির গেরুয়া পরিহিতা ইন্দিরাও একবার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেছে—যেন মুহূর্তের দেখা কোনো দিব্যমূর্তি।

কিন্তু আমার কাছে এ-বইয়ের সব ক'টি চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য চরিত্র বোধ হয়েছে মতিলালের স্ত্রী, জওহরলালের বৃদ্ধা মা-কে। প্রেমে আর বিশ্বাসে কি দৈব রূপান্তর ঘটিয়েছিল তাঁর জীবনে। দুঃখ আর ভাগ্যের বিড়ম্বনা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি, ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণুতা আর কি অপরাজেয় সাহস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তাঁর ক্ষুদ্র দেহে! প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁকে সোনাদানায় কিংখাবে মুড়ে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল—যেন এই হারায় হারায়, সেই নারী কি মন্ত্রে এমন শিখার মতো জ্বলে উঠলেন। স্বাধীনতার দুর্গম পথের যাত্রী তাঁর স্বামীপুত্রকে পর্যন্ত প্রদীপ্ত ক'রে তুললেন নিজের প্রেরণার আলোকে!

কৃষ্ণার তুলিতে অকালবিধবা বড় বোনের আলেখ্যও ভারি মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছে। নেহেরু-পরিবারের জন্য নিজের জীবনকে তিনি সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। ছোট বোনের প্রতি শেষ কর্তব্যটুকু সমাপন করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করলেন—মৃত্যু তাঁদের প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারেনি।

এই আশ্চর্য পারিবারিক ইতিহাসের উপর পড়েছে জীবনের

চিরন্তন, অবিচ্ছেদ্য আলোছায়ার মায়াজাল—তাতে উজ্জ্বল আলোও আছে, সকরুণ স্তিমিত ছায়াও আছে।

ছাপার হরফের কথা এখানেই শেষ, কিন্তু নেহেরু-পরিবারের জীবন্ত কাহিনী এখনো পথ কেটে চলেছে। যশস্বী পিতা ও যশস্বী পুত্র দেশপ্রেমের যে-বিরাট ঐতিহ্যবোধ রচনা করেছেন তার ভার তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও বহন ক'রে যেতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সরোজিনী নাইডু
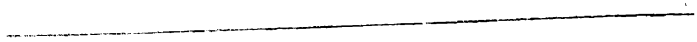
পরিচয়

উৎকৃষ্ট ছবির জন্যে সহজ ফ্রেমই ভালো ; কাঠের সুমিত সৌন্দর্য পটের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাঁধাইয়ের দিকে নয়। কৃষ্ণা হাতিসিং তাঁর কাহিনীটিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন, আশে পাশে যেটুকু মন্তব্য আছে তার উদ্দেশ্য মূল আখ্যানকে ফুটিয়ে তোলা। গল্পটি যেন নিজেকেই নিজে বলছে, কেন্দ্রে রয়েছে একটি মহাসদন, সেই গৃহনাট্যে যাঁরা অধিবাসী হয়ে যোগ দিয়েছেন তাঁরা আজকের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। লক্ষ লোকের চিত্তে উদ্বোধিত আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রতীক হয়ে দেখা দিল নেহেরু পরিবারের এই বাড়ি—জনজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র এই আনন্দ-ভবন। মুক্তি-সাধনার যে-আনন্দ ঐখান থেকে উৎসারিত হয়েছে আজো তার বিরাম নেই, শত দুঃখ অত্যাচারের চেয়ে তার মূল্য কত বেশি। গল্পটির প্রারম্ভে দেখি বাড়ির বাগানে আলো পড়েছে, পুনরুজ্জীবনের সেই অরুণিকা ; মধ্যাহ্নের ঔজ্জ্বল্যে দেখতে পাই আঙিনা ভ'রে বহু লোকের সমাগম, কর্মের প্রবল উৎসাহে ঐক্য-শক্তির প্রতিষ্ঠা ; তীব্র ঘটনা ও বীর্যের কত মহাপ্রসঙ্গ বাড়ির হাওয়াকে চঞ্চল উদ্দীপিত করল। স্তব্ধ শোকের দিনে দেখি জানলায় পর্দার আড়াল পড়েছে, কিন্তু ঐ পরিবারের অন্তরঙ্গ কারো মৃত্যুতে সমগ্র দেশেই আত্মীয়শোক উথলে ওঠে। আনন্দ-ভবনের কন্যা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে আমাদের অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন, ঘরে প্রাঙ্গণে পারিবারিক ঐতিহ্যের বিচিত্র প্রকাশ, শিল্পসাধনা ও বীর্যসম্পন্নতার নিভৃত ছবি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হল। অবশেষে যখন কাহিনীর শেষে বাড়ির দরজা খুলে বাহিরে

আসি তখনও মন বেশি দূরে যায় না—এই সহজ ইতিবৃত্তের যোগে একটি পরিবারের সঙ্গে আমাদের চিরদিনের মমত্ব রয়ে গেল।

গ্রন্থের চিত্রাবলীর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট আঁকা হয়েছে পিতা ও তাঁর পুত্রের প্রতিকৃতি। সর্বজনবিদিত তাঁরা, কিন্তু লেখিকার সূক্ষ্মতম পরিচয়ের তুলিতে তাঁদের একটি সহজ মানুষ রূপ ধরা পড়ল; আত্মীয়তার অন্তর্দৃষ্টি চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, নূতন তথ্য ও ঘটনার দ্রুত সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে পিতাপুত্রের প্রাণবন্ত স্বরূপ জেগে উঠেছে। ইতিবৃত্ত এসে থেমেছে একেবারে সাম্প্রতিক অধ্যায় পর্যন্ত, যদিও আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ দেশ-নেতাদের বিষয়ে প্রায় কোনো তথ্যই আর প্রকাশ করবার উপায় নেই। সত্য প্রচারের ভাষা গায়ের জোরে বন্ধ করা হয়েছে। অসহ্য এই শাসিত নিস্তব্ধতার আড়াল থেকে কোনো বার্তা এলেই দেশ জুড়ে তাই এমন সাড়া পড়ে যায়; জওহরলালের প্রত্যেক কথা, তাঁর লেখা পারিবারিক চিঠিপত্রের ছিন্ন অংশও আমাদের ব্যথিত চেতনাকে আলোয় ভ'রে দেয়। কী আশ্চর্য তাঁর এই পত্রাবলী; কয়েকটি চিঠি খুবই সম্প্রতি তিনি লিখেছেন। ভাষায় শুধু যে সহজাত মহিমা এবং তাঁর অন্তরতম বিনম্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা নয়; তাঁর ক্ষমাশীল উদার মনের ঐশ্বর্য প্রসাদগুণান্বিত শিল্পরূপ ধারণ করেছে। জওহরলালের মতো গদ্যলেখক এ-যুগের বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ তা অনেকেই জানেন।

কৃষ্ণা হাতিসিং-এর বইয়ে অবিস্মরণীয় আরো ছবি আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে করুণ পুণ্যোজ্জ্বল মূর্তি তাঁর মাতৃদেবীর। লেখিকার পরম শ্রদ্ধা ও আদরের মাসিমা আলেখ্যমালায় বিশিষ্ট স্থান পেয়েছেন; নিরালা পটে আঁকা তাঁর বিনম্র শুভ্র চরিত্র আমাদের

মুগ্ধ ক'রে দেয়। আনন্দ-ভবনের মর্মকক্ষে তাঁরা চিরদিনের মতো থেকে গেলেন, সমগ্র দেশের স্মৃতিলোকের অধিবাসী হয়ে। পরিবারের বাহিরেও যাঁরা আপন, এমন অনেকের চারিত্রচিত্রণ এই বইয়ে দু-একটি রেখার টানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; আখ্যানের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে বইখানি রাষ্ট্রনৈতিক নয়, যদিও বলা চলে বইয়ের সবখানিই রাষ্ট্রনৈতিক। তার কারণ যেখানে রাষ্ট্রিক ঘটনা আমাদের গভীরতম জীবনের সঙ্গে এক হয়ে দেখা দেয় সেখানে স্বতন্ত্রভাবে তার রাষ্ট্রিকতা আর থাকে না। সৃজনধর্মী মানবিকতার প্রসঙ্গ হতে পৃথক ক'রে কেবলমাত্র দল বা দলীয় রীতি-নীতি-পদ্ধতির যোগে তার বিচার বা প্রচার চলে না। রাষ্ট্রনৈতিক বহু ঘটনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কিন্তু সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে আমাদের সভ্যতার যে একটি অখণ্ড সত্তা আছে তারই প্রকাশমান ধারায় ঘটনাগুলিকে দেখানো হল। জাতীয় আন্দোলনের বহিরাঙ্গনে তাদের যথার্থ জানা যায় না, যেখানে তারা সমগ্র এবং অনিবার্য হয়ে লক্ষ লোকের জীবন আলোড়িত ক'রে দিচ্ছে সেই ঐতিহাসিক সত্যের ভূমিকায় লেখিকা ঘটনার নিহিতার্থ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দেশজোড়া মানুষ যখন স্বভাবতই চরম ত্যাগ ও বীর্যকে বরণ ক'রে নিয়েছে, আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রাত্যহিক ব্যাপারের মতোই সহজ সেই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক উগ্র বচন এবং আস্ফালন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কঠিন নিষ্ঠা এবং দায়িত্বরক্ষার অভ্যাস নেহেরু পরিবারের দৈনিক কৃত্যের মতো সকলে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, এই স্বীকৃতি ব্যক্তিগত এবং জাতি-গত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণা হাতিসিং তাই কত অনায়াসে এ-বিষয়ে লিখে গেছেন, তাঁর দৃষ্টি শিশুর মতো অব্যবহিত এবং

নিঃসঙ্কোচ কেননা বড় বড় ঘটনাকে তিনি সর্বান্তিক মূল্য দিয়ে আপন ক'রে জেনেছেন। অন্যায়ের স্পর্শে তাঁর ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠেছে, জাতি বা ব্যক্তির প্রতি অন্যায়কে তিনি লেশমাত্র ক্ষমা করেননি, প্রাণ দিয়ে আক্রমণ করেছেন, তাঁর লেখা পড়লেই তা বোঝা যায়, কিন্তু সমগ্রের মূল্যবোধ তাঁর সহজাত এবং তা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে ব'লে পাঠকের মনও একটি ঐক্যের সুরে সাড়া দেয়। বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে উত্তেজিত করা এই আত্মকাহিনীর উদ্দেশ্য নয়।

লক্ষ্ণৌ জেলের বর্ণনায় লেখিকার যুগ্মদৃষ্টির উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই— স্বতন্ত্র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সূক্ষ্মবোধ একত্র প্রবাহিত হয়েছে, ভিতর ও বাহিরের তথ্যে সত্যে অপূর্ব মিলিত রূপ দেখা দিয়েছে। তিনি ঐ জেলখানায় অনেক মাস ছিলেন। কয়েদী অন্যান্য মেয়েরা কেউ দেশপ্রেম অথবা মানবহিতৈষণার দোষে বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়নি, তাঁর সঙ্গিনীরা নরঘাত এবং বিবিধ ক্রূর পাপের জন্যে সাধারণ আইনে দণ্ডিত হয়ে সেখানে আসে। লেখিকা সেই জটিল ইতিবৃত্তের সবটাই দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, কিছুই বাদ দেননি অথচ সমস্ত মানুষের সমাজ যেখানে এই অবস্থানের জন্যে দায়ী সেখানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সভ্যনামধেয় বর্বরতার সামাজিক পরিচয় স্পষ্ট দেখানো হয়েছে; আজো আমরা মানুষকে কী ভাবে বিপন্ন করি এবং শাস্তির নাম ক'রে দায়িত্বহীন বিধির অনুসরণ করি তা বাচুলি নামক অপরাধিনীর কাহিনীটুকু পড়লে বোঝা যায়। এখানে রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতির চেয়েও বড় ভূমিকা স্বতঃই প্রকাশিত, আমাদের মনুষ্যত্বের মূলে আঘাত লাগে। জটিল তত্ত্ববিচার ও কূটতর্কের সুরঙ্গ দিয়ে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হতে পালানোর পথ থাকে না—বাচুলিকে মানুষের মূল্য

দিয়ে দেখে তবে তার আচ্ছন্ন আত্মার কাহিনী শুনতে হয়। কেবল-মাত্র দণ্ডের তাড়নাই যে অর্ধ-সভ্য মানুষজাতির একমাত্র উত্তর, দোষীকে যান্ত্রিক অত্যাচারে পিষ্ট ক'রে লোকচক্ষের আড়ালে রেখে যে মানব-সমাজ দায়িত্ব হতে মুক্তি চায় তার নিদারুণ প্রহসন বা ট্র্যাজেডি এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। তারপর দেয়ালের বাধা পড়ল, লেখিকা শেষদৃষ্টিতে একবার লোহার দরজার ও-পাশে ছায়াপ্রায় মূর্তিগুলির দিকে চেয়ে দেখলেন। যে-পথ দিয়ে তাঁকে বৃহৎ বিশ্বে ফিরে আসতে হল সেইটেই যেন তাঁর কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছিল—যারা পড়ে রইল তাদের সত্য আমরা কি কখনো স্বীকার করেছি। সমস্ত ঘটনা বিশিষ্ট এবং সার্বজনীন রূপ নিয়ে এই বইখানিতে চিরন্তন হয়ে আছে। জেল থেকে বেরিয়ে লেখিকা নানাভাবে এই দুর্ভাগ্যবতীদের জন্যে যা-কিছু করতে চেষ্টা করেছিলেন তার বৃত্তান্ত এখানে নেই কিন্তু আমাদের সামনে দায়িত্ব জেগে রইল। প্রতিবিধানের উপায় এক নয়; সমাজ, স্বাস্থ্য, আইন সংস্কার, জেলখানা অনুষ্ঠানটির বিষয়ে আদ্যোপান্ত নতুন চিন্তা ও কর্মের বহু উপায় একত্র অনুশীলন করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সমগ্র দৃষ্টির বেদনা জাগা চাই।

এই বইখানি তথ্যের তালিকা নয়, ছাঁচে ঢালা নিখুঁৎ নিরেট রচনা নয়, এতে শিল্পীর সূক্ষ্ম রেখা বর্ণবিন্যাস প্রাণবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। চল্‌তি স্রোতে আবর্তিত ঘটনা ভাবনার খণ্ডমালা প্রাণের রস সঞ্চার ক'রে যায়,বাঁকে বাঁকে তার অন্তর্লীন পরিণতি। মতামত ব্যক্ত করা বা কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্যে যুক্তির সবখানি অবতারণা করা হয়নি, অলক্ষ্যে তার প্রভাব আপনিই ছড়িয়ে গেছে। অভিযানে বেরিয়ে প'ড়ে প্রতি পৃষ্ঠাতেই আমরা নতুন

স্থানে গিয়ে পৌঁছই, যদিও কখনো পুরনো স্মৃতি কখনো সদ্য ঘটনা গল্পে মিশ্রিত হয়ে দেখা দিয়েছে। আত্মকাহিনীর এই পথই প্রশস্ত। লেখিকা কত সহজে তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের কথা, তাঁর সখের কাজ খেলা ভুলভ্রান্তি সাধনা সংগ্রামের কথা বলেছেন; তাঁর স্বামীর নিভৃত ত্যাগশীল জীবনের কথা, ছেলেমেয়েদের উৎসাহ হাসিভরা ঘরের কথা এই ছোট বইখানিতে হঠাৎ দেখা দিয়ে আমাদের চমৎকৃত ক'রে দেয়। রচনার প্রসাদগুণ পাঠকের মনে সঞ্চারিত করাতেই লেখকের কৃতিত্ব।

সহজ ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর ছবি—অল্প কথায় বইখানির এই পরিচয় দেওয়া চলে। এই রকম আরো চিত্ররচনা লেখিকার সুদক্ষ তুলিতে আঁকা হবে এই প্রত্যাশা রইল—বইখানির বিষয়বস্তু তো শেষ হয়নি, আরো যোগ হচ্ছে। যাঁদের কথা এই গ্রন্থে লেখা হয়েছে নব নব অধ্যায়ে তাঁদের জীবন পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে মহাচরিত্রবান জাতীয় নেতৃবর্গ তাঁরা, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের প্রকাশ। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে শাসকের দল তাঁদের ক্ষতি করতে চেয়েছে, কালিমা লেপন ক'রে অন্তরালে রাখতে চেয়েছে কিন্তু অনশ্বর উজ্জ্বল তাঁদের স্বভাব স্পষ্টতর হয়ে মানবচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হল উন্মত্ত শক্তির ক্রিয়া আজ যতই প্রবল হোক তার অবসান হবে। ভারতীয় মুক্তিজাগরণের ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে মূঢ়ের প্রবর্তিত মিথ্যা ঘোষণাকে খণ্ডিত করবে সেই দিন সমাগত। শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি এই চরম যুগে ভারতবর্ষ এবং সমগ্র মানবজাতিকে পথ দেখাতে এসেছেন—যিনি আজ তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গেই কারাবরণ ক'রে আছেন—তাঁর চারিত্রের পূর্ণ মহিমা সমগ্র মানবসমাজে ক্রিয়াশীল; নূতন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবে তাঁরই

প্রতীতি এবং প্রেরণায়। এই নূতন অধ্যায়ের ইতিহাসও লেখিকার আত্মজীবনীতে সূচিত হয়েছে; কালের অন্ধকার ছিন্ন ক'রে চিরন্তন ভারতীয় চারিত্রের মৈত্রপ্রভাব এই গ্রন্থকে স্পর্শ করল। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রেমের অপরাজেয়শক্তি সেই মানব প্রেমের অপরিমেয় বীর্য এই আত্মজীবনীর মর্মে মর্মে উদ্ভাসিত হল।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচনা

তিন বছর আগে স্বামী অনুরোধ করেছিলেন লিখতে, আমিও অনেকবার ভেবেছিলাম লিখি-লিখি, কিন্তু আরম্ভ করা আর হয়ে ওঠেনি। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে রাজা জেলে যেতেই বড় একা প'ড়ে গেলাম ; ঠিক করলাম বই এইবার লিখবই। ছুটো অধ্যায় লেখা হতে না হতেই আমার বড় ছেলের হল টাইফয়েড —বই লেখা রইল বন্ধ। সত্যোমুক্ত রাজা আর আমি বহু উদ্বেগে কাটালাম কয়েক মাস ছেলের অসুখ নিয়ে। সে সেরে ওঠবার পরেও আর বই লিখতে বসা হয়ে ওঠেনি।

বছর খানেক কাটল ; রাজার আবার ডাক পড়ল জেলে আর আমি আবার প'ড়ে গেলাম একা। প্রথম কয়েক মাসের গ্লানিতে মন কোনো কাজেই বসতে চাইল না। তবু একদিন এ-অবস্থাও সহজ হয়ে এল। সময় যখন আর কাটে না, তখন আবার মনে হল, নতুন করে শুরু করি বই লেখা। মনে ভিড়-করে-আসা স্মৃতিগুলোকে ভাষায় রূপ দিতে দিতে এই সুদীর্ঘ, সঙ্গীহীন মাসগুলো যেন একটু কম একা, একটু সহনীয় হয়ে উঠল। মন অবশ্য মাঝে মাঝে রাজার সাহায্যের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত। একটু কঠিন হলেও জওহরের সমালোচনা আমার ভারি ভালো লাগত—তারও পথ বন্ধ। আমাদেরই এক বন্ধু সময় ক'রে নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন ব'লেই এত তাড়াতাড়ি বইটা শেষ হল। মাঝে মাঝে যখন মনে হতো আর পারছি না, বিষণ্ণতা পেয়ে বসত মনকে, তখন তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ না পেলে আমি লিখতেই পারতাম না।

গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ডাক্তার অমিয় চক্রবর্তীকে। তাঁকে আমি 'অমিয়দা' বলি; তিনি আমার গুরু। অনেক দিন ধ'রে তিনিও আমাকে বলছিলেন একটা স্মৃতিকথা লিখতে, কিন্তু আমার নিজের সামর্থ্যে সন্দেহ ছিল। আমি বেশ ভীত হয়ে পড়তাম তাঁর আমার এই সামর্থ্যে স্থির বিশ্বাস দেখে। তাঁর কথা আমি না শুনলেও তিনি যখনই আমাকে চিঠি লিখতেন তখনই ঐ কথার উল্লেখ করতেন; আর রাজাও যারবেদার অন্ধকার কারাগৃহ থেকে উৎসাহিত করছিল আমাকে। তাই, অনেকখানি দ্বিধা সত্ত্বেও শুরু করলাম লেখা।

এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে অমিয়দা সম্মানিত করেছেন আমাকে। আমি তাঁর কাছে গভীর ভাবে ঋণী—শুধু এই জন্যেই নয়, তিনি আমাকে যত উৎসাহ উপদেশ দিয়েছেন—সব কিছুর জন্যে।

অসুস্থতা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের 'পরিচয়' দেবার জন্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তাঁকে অনেক দিন থেকে জানি। আর আমার পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা—এ তো সর্বজনবিদিত।

'বিশ্বভারতী'র জন্য লেখা 'স্মৃতিকথা,' 'স্টেটস্‌ম্যান্'-এর জন্য লেখা 'বাচুলি' এবং 'হিন্দু'তে প্রকাশিত 'দুই বোন'—এই তিনটি প্রবন্ধের এখানে পুনরাবৃত্তির জন্যে প্রকাশকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রস্তাবনা

'এখনো রাত্রি নামেনি, এখনো নয়,
জন দুই তিন এখনো পাহারা জাগে।
তবু আঁধারের নিবিড় কালিমা এমন ঘনায়মান,
জেগে আছে যারা বিনিদ্র পাহারায়
প্রভাতের মুখ দেখার আগেই
তারাও বুঝিবা হারাবে তাদের প্রাণ।'

—পিয়ের ভ্যান প্যাসেন

জওহর আর রাজাকে ধরবার জন্যে পরোয়ানা নিয়ে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট, ঠিক ভোর পাঁচটায়, বম্বে-পুলিশ এসে হানা দিলে আমাদের দরজায়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের জন্যে অত্যন্ত পরিশ্রমে আমরা সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বর্তমান ঘটনাবলী নিয়ে আলাপ আলোচনা ক'রে মধ্য-রাত্রিতে আমাদের অতিথিরা চলে গেলে—জওহর, রাজা আর আমি আরও ঘণ্টাখানেক কথাবার্তা ব'লে শুতে গেলাম।

এমনিই তো রাত্রি জাগার পর ভোরে ঘুম ভাঙালে বিশ্রী লাগে, তার ওপর আবার দোর-গোড়ায় পুলিশ! আমি বেঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম, দরজায় ঘণ্টা নাড়া শুনতে পাইনি। জেগে উঠেই কিন্তু বুঝতে পারলাম কি হয়েছে, কাউকে আর বলে দিতে হল না। পুলিশ ছাড়া এই অসময়ে আর কে আসতে পারে! পরোয়ানা একা জওহরের নামে মনে করে তার ঘরে ছুটে গেলাম। একান্ত ক্লান্তিতে চোখের পাতা খুলতে পারল না সে, ঘুমের ঘোরে কিছু বুঝতেও পারল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা

বাড়ি জেগে উঠল। ভালো ক'রে এতক্ষণে বুঝলাম যা হবার তাই হয়েছে। জওহরকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিতে গেলাম যাওয়ার জন্যে। রাজাও কতকগুলি বই গুছিয়ে দিচ্ছিল; এমন সময় আমার ভাইঝি ইন্দিরা এসে বললে, 'রাজা ভাই, তুমিও তৈরি হয়ে নিচ্ছ না কেন?' আমি চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলাম, 'কেন?' ইন্দিরা বললে, 'ওর নামেও পরোয়ানা আছে যে।' আমাদের কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে, প্রথম খেপে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের ছাড়া আর কাউকে ধরবে না। দেখলাম ভুল হয়েছে।
রাজাও গুছিয়ে নিল জিনিসপত্র। বড় শিগগির সব প্রস্তুত হয়ে উঠল যাবার জন্যে। বিদায় দিলাম তাদের; পুলিশের পাহারায় তারা গাড়িতে গিয়ে উঠল। জওহর যে কোথায় গেল জানিনা, রাজাকে নিয়ে গেল পুনায়—যারবেদা সেন্ট্রাল জেলে। হাত নেড়ে তাদের বিদায় দিলাম, ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসলাম কপালে কি না জানি আছে এইবার!
তখন আমাদের ফ্ল্যাটে অতিথির ভিড় উপচে পড়ছে—চলে গিয়েছে শুধু দুজন; তবু মনে হল সব কিছুই বদলে গিয়েছে। কি যেন নেই। যে প্রাণশক্তিতে সমস্ত জায়গাটা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল তারই অভাবে এখন সে ঊষর, পরিত্যক্ত ব'লে মনে হল। দিনের পর দিন ধরে লোকের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন আরও বেড়ে গেল। বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, খবরের কাগজের রিপোর্টার—সকলেই উদগ্রীব পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরের জন্যে। আমাদের মন তবু ঘুরে ফিরছে ঐ যে দুটি লোক চলে গেল, তাদেরই চারদিকে।
আরও অনেকবার তো এই একই ব্যাপার ঘটেছে—অভ্যাস হয় না কিছুতেই। প্রতিবারই হতবুদ্ধি হয়ে যাই, একা লাগে।

আজ এক বছর হল আমার যারা একান্ত আপন তারা কঠিন লোহার বাঁধনে—বহু দূরে। তাদের দেখা পর্যন্ত বারণ। তাদের অনুপস্থিতি জীবনে বিরাট শূন্যতা এনে দিয়েছে। আমি হতাশ হইনি, দ্বিধা বোধ করিনি তবু। কখনও সন্দেহ হয়নি মনে যে এরা অন্যায় করছে—ভুল করে শাস্তি পাচ্ছে। বুঝেছি এ-শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের জীবনে এক বছর সময় এমন কিছু নয়—জাতির জীবনে তো অকিঞ্চিৎকর। সেই এক বছরই দীর্ঘায়িত হয়ে মনে হয় মাসগুলো যেন আর কাটে না। অনেক আন্দোলন জীবনে তো দেখলাম, হয়তো আরও কত দেখব। আমাদেরই মতো আরও কত সহযাত্রী এমনি করেই তো হাসি-কান্নার দোলায় দুলেছে। এমন সময় গিয়েছে যখন উৎসাহে আনন্দে ভরে উঠেছে মন, আবার কখনও বিষাদে গিয়েছে ছেয়ে। ছায়ার, অন্ধকারের ঘোরের মধ্যে পথ খুঁজে পাইনি কত সময়। আবার সেই অন্ধকারেই কখনও আলোর রেখা পেয়েছি—নতুন সাহস, নতুন আশা পেয়েছি সংগ্রাম চালিয়ে যাবার।

এই বিশৃঙ্খলতা, একাকিত্বের মধ্যে বহু স্মৃতি মনে ভিড় ক'রে এল। মনটাকে একটু ব্যস্ত রাখবার জন্যে সেগুলি টুক-টাক ক'রে কাগজে বসাতে-বসাতে এই স্মৃতিকথাটি গড়ে উঠল। লিখতে লিখতে শৈশবের এবং কৈশোরের বহুদিন যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠল আমার সামনে। তাদের কোনোটা কাঁদাল, কোনোটা আবার হাসাল! সবই কিন্তু মনে এনে দিল গভীর শান্তি।

আমার শৈশব কেটেছে গভীর শান্তির মাঝখানে। আমাদের পরিবারটি ছোট, সংহত; দুঃখকষ্টের স্পর্শ গায়ে বিশেষ লাগেনি। ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল জীবনে। সে পরিবর্তন আমাদের মধ্যে

কোনো বিচ্ছেদ আনেনি। পরে, ঘটনাস্রোতে সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লাম। জীবনের পথে কত নতুন ধারা, কত নতুন রীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হল নিজেকে। সেই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এসে আজ মনে হয়, যাই আসুক না কেন, ভয় কিছুতেই পাবার নেই। কয়েক মাস আগে, ঠিক ক'রে বলতে গেলে দশ মাস আগে, 'ভারতের কোনোস্থানে' জওহরকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। এই পনেরো বছরে আমাদের পরিবারে যত কিছু ঘটেছে—সব কিছুর উপরেই মন্তব্য করেছিলাম তাতে। আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি আর কি যে হতে পারি তার স্পষ্ট ছবি এঁকে দিয়েছে জওহর তার উত্তরে। এত দুঃখ কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও কোনো খেদ নেই মনে। সে লিখেছে :

'তুমি ১৯২৮ সালের কথা লিখেছ—তখন আমরা কত কাছাকাছি ছিলাম। যাদের ভালোবাসতাম তাদের অনেকে আজ নেই, আর যারা আছে তারাও এমন বিক্ষিপ্ত আর বিচ্ছিন্ন—যে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর্যন্ত সম্ভাবনা নেই। প্রত্যেক পুরুষে নতুন ক'রে জীবনের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেতে হবে—না ঠেকে কেউ শিখতে পারে না। কিন্তু এই পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি হচ্ছে—আজকের জীবনবেদের চেয়ে কালকের জীবনবেদ আরও উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে। আজকের লোকের মনের অবচেতনায় পূর্বপুরুষের সাফল্য-নিরাশার স্মৃতি থেকে গিয়েছে যে! অতীত শুধু ভার নয়, সে অনুপ্রেরণাও দেয়—সে পিছন দিকে তাকাতে ব'লে আবার সামনের দিকেও চালায়। কখনও মনে হয় আমার জোর অনেক, প্রাণশক্তি আমার প্রচুর, আমি অনেক কিছু করব। আবার কখনও মনে হয়, হাজার বছরের চাপে আমি পিষ্ট, আমি ক্লান্ত—এই অন্তহীন, আশাহীন পথে আর

চলতে পারব না। দুটো ধারাই আছে আমাদের মধ্যে, দুটোর অবিরাম মিশ্রণে আর সংঘর্ষে প্রতিদিনই নতুন হয়ে গ'ড়ে উঠছি। অতি প্রাচীন জাতি আমরা। অনেক দিনের সভ্যতা, অনেক আগের মানুষের বহু উদ্দাম কামনা-বাসনা, দ্বন্দ্ব, সন্তোষ, শান্তি, অশান্তির ধারা বয়ে চলেছে আমাদের মধ্যে। তরুণ কোনো জাতির চেয়ে আমরা এ-সব অনুভব করি অনেক বেশি। আর, এমন একটা স্থৈর্যের সন্ধান দেয় এই সভ্যতা—যা শত চঞ্চলতা, শত ঘটনার প্রতিঘাতেও কেন্দ্রচ্যুত হয় না। প্রাচীন সংস্কৃতির এই হল চরম পরিচয়। এ-ঐশ্বর্য চীনের আছে প্রচুর। এই ঐশ্বর্য আছে ভারতবর্ষের। ভারতের কল্যাণ তাই অনিবার্য।

যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি কুড়িজন নিয়ে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। সেই মস্ত সংসার ভেঙে ভেঙে ছোট হয়ে গেল, সেই ভাঙা অংশগুলি আবার নতুন সংসারের সূচনা করলে। তবু তাদের মধ্যে স্নেহের বাঁধন একটুও কমেনি, তারা এক স্বার্থে কাজ করেছে। আর এই সব ক্ষুদ্র অংশগুলি মিলে এক অখণ্ড একত্বের আভাস দিচ্ছে। এই ধারা চলে, চোখে পড়ে না কারও। এর গতি কোনো কারণে দ্রুত হলেই ঘা লাগে এসে। গত পাঁচ বছর ধ'রে চীনে কি হয়েছে ভাব তো, আর এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ে কত লক্ষ লক্ষ পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সে জাতি আজও বেঁচে রয়েছে। আরও প্রাণবান হয়ে উঠেছে আজ। আর, যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্বেও ব্যক্তি পরম্পরায় সেই জাতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, চীনের মতো একটা বিপর্যয় ভারতবর্ষের প্রয়োজন আছে। যাই হোক, আমাদের মতো আমরা, চলেছি আর ধীরে ধীরে গড়ে তুলছি নতুন এক জাতি।'

কোনো খেদ নাই

'মধুপের মতো যেখানে কুসুম-কোরকে
মধুপানরত আশা,
কাব্য তো সেই মধুর কুঞ্জবনে
মলয়ের যাওয়া আসা।
সবই ছিল মোর তরুণ বয়সে
প্রকৃতি, আশা ও কাব্যলক্ষ্মী সাথী
জীবন ফিরেছে ফাল্গুন-উৎসবে
পরমোল্লাসে মাতি।'—কোল্‌রিজ্‌

১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে, এক প্রখর শীতের সকালে, প্রয়াগের পুণ্যতীর্থে আমার জন্ম। এখন প্রয়াগের নাম এলাহাবাদ। আলোয় সারা বাড়ি উজ্জ্বল; রাত্রি গভীর তবু কারও ঘুমোবার নাম নেই—মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে শিশুর। মা-কে অনেক কষ্ট দিয়ে আমি জন্মালাম, মোটা-সোটা হৃষ্টপুষ্ট; একটুও তখন বুঝিনি আমাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়ে তাঁর কোমল দেহ পৃথিবী ছেড়ে যাবার উপক্রম করেছিল। দিনে দিনে আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম, আর মা জীবন-মৃত্যুর মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ দুলতে লাগলেন।

মা সেরে উঠলেও বহুদিন অকর্মণ্য হয়েই রইলেন—আমাকে দেখাশোনা করবার ভার পড়ল পিশিমা আর ধাত্রীদের ওপর। তিন বছর যখন বয়স, আমার বোন 'স্বরূপ'কে যে গভর্নেস দেখাশোনা করতেন—তিনিই আমার ভার নিলেন। জওহর আমার চেয়ে আঠারো বছরের আর আমার বোন আমার চেয়ে সাত

বছরের বড়। তাই সঙ্গীহীন হয়ে আমি একা একা বেড়ে উঠতে লাগলাম। ওদের সঙ্গে আমার যোগ ছিল না বললেই চলে। আমার জন্মের সময় জওহরভাই বিলেতে। পাঁচ বছর বয়সে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

আমার যখন জন্ম, বাবা তখন বিখ্যাত আইনজ্ঞ, যশ এবং অর্থ দুই-ই তিনি অর্জন করেছেন। জওহরের যখন দশ বছর বয়েস তখন তিনি 'আনন্দ-ভবন' কিনেছেন। 'আনন্দ-ভবন' না কি বড় পবিত্র স্থান। চোদ্দ-বছর বনবাসের পর ফিরে এসে রাম এইখানেই প্রথম ভরতের সঙ্গে দেখা করেন। কাছেই ভরদ্বাজ আশ্রম। পুরাকালে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন এটি তীর্থক্ষেত্র। প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় খুব ভীড় হয় আমাদের বাড়িতে প্রতি বারো বছর। লক্ষ লক্ষ লোক তখন পবিত্র সঙ্গমে স্নান করতে আসে। এত লোক এসে জমে আমাদের বাড়িতে যে তাদের সুব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে একটু-আধটু বিশ্রাম ক'রে আবার চলে যায়। মাঘমেলার সময়েও লোক আসে প্রতি বছর—তবে অত নয়। যারা আসত তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আমাদের বাড়ি না দেখে ফিরত। প্রথমত : আমাদের বাড়িটি পবিত্র তীর্থ আর দ্বিতীয়ত : বাবা আর জওহর সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল—এত নাম শুনি এদের, লোক দুটি কি রকম দেখে যাই।

আনন্দ-ভবনের গড়নটা অগোছালো—চারদিকে বারান্দা, আর একটা মস্ত বড় বাগান। বাড়ির একদিকে একটা মাঠ, পিছনে ফলের বাগান, সামনে আর এক ফালি লম্বা বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস এবং টেনিস-মাঠ। গ্রীষ্মাবাসের মধ্যে, পাথরের উপর পাথর দিয়ে ছোট্ট পাহাড়ের মতো সাজানো, তার উপর একটি

শিবমূর্তি বসানো। একটি ক্ষীণ জলধারা শিবের মাথা থেকে বেরিয়ে নিচে সৃষ্টি করেছে এক জলাশয়—তার চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে থাকে। পরে নতুন বাড়ি হবার সময় এই গ্রীষ্মাবাসটি ভেঙে ফেলা হয়। বাবা ঘোড়ায় চড়তে আর শিকার করতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর অনেক ঘোড়া, গাড়ি, কুকুর, মোটরগাড়ি ছিল। আস্তাবলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে আমি ঘোড়াগুলিকে দেখতাম। আমার নিজের ছিল একটি ছোট্ট, সুন্দর, দুধের মতো শাদা টাট্টু। বহু লোকে বহু দাম দিয়ে চেয়েছে তাকে কিনে নিতে, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হননি। আমি তাকে অবশ্যি বেশিদিন রাখতে পারিনি ; সাপে কামড়ে সে একদিন আস্তাবলেই মারা গেল। আমি বহুদিন ধরে কেঁদে তার ভালোবাসার ঋণ শোধ করলাম।

ছোটবেলায় দেখেছি আত্মীয়স্বজনেরা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে থাকতেন। ছোট ছেলেরাও থাকত, আমি তাদের সঙ্গে খেলা করতাম। আমার ভেবে অবাক লাগত মা তাঁর রোগশয্যা থেকেই কেমন ক'রে সকলের উপর নজর রাখতেন, আর বাবা তাঁর অত কাজ থাকা সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে এক-আধ মিনিট কথা বলবার, তাদের তত্ত্বাবধান করবার অবকাশ ক'রে নিতেন। আপাত ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সকলের উপর ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

আমার আগে এক ভাই হয়েছিল আমার—সে বাঁচেনি। মা এই শোক কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আমি যখন মেয়ে হয়ে জন্মালাম মা ভারি হতাশ হয়ে পড়লেন, বাবার অবশ্য কিছুই এল গেল না। অদ্ভুত, নির্জন, সঙ্গীবিহীন শৈশব কেটেছে আমার। কড়া নিয়মে আমার ওঠার মুহূর্ত থেকে রাত্রে শোবার মুহূর্তটি পর্যন্ত বাঁধা। ভারি রাগ হতো আমার। অন্য সব

ছেলেমেয়েরা কেমন সব খেলা করে বেড়াত। তাদের গভর্নেসও ছিল না, কিছুই না। আমি তাঁর কর্তৃত্ব না মেনে প্রায়ই অবাধ্য হয়ে উঠতাম। আমি ছিলাম একটু একগুঁয়ে খামখেয়ালী ধরনের। শাসন আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। চটে উঠি তাই সহজেই, তবে ছেলেমানুষী রাগ, থাকে না বেশিক্ষণ। কিন্তু হলে কি হবে? এই মেজাজ আমাকে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলত। ঈর্ষা-পরবশ হয়ে চটতাম না কিন্তু কখনও।

শাস্তি পাওয়া, ঘরে তালা-বন্ধ থাকা, খাওয়া-বন্ধ, আমার কপালে ঘটত। দিদির এ-সব কিছুই সইতে হতো না! সে ছিল শান্ত শিষ্ট—বোধহয় অবাধ্য হওয়ার চেয়ে বাধ্য হওয়ার জ্বালা অনেক কম ব'লে। এত রাগারাগি বকাবকি সত্বেও আমি গভর্নেসকে গভীর ভালোবাসতাম, তিনিও বাসতেন।

ছেলেবেলায় বাবা মা-কে খুব কমই দেখতে পেতাম। বাবা সব সময়েই কাজে ব্যস্ত, শুধু সকালে আর বিকেলে একটু তাঁকে দেখতাম। মাকে একটু বেশি দেখতাম বটে তবে ঐ দেখা পর্যন্তই—ঘনিষ্ঠতা হতো না। একটু ভালো থাকলেই মা আর চুপ করে থাকতে পারতেন না—একটা না একটা কিছু করতেনই, যদিও তাঁর ক্ষুদ্রতম আদেশটুকু পালন করবার জন্যে বাড়িতে চাকরের ফৌজ ছিল। তাঁকে আমি খুব ভালোবাসতাম, পূজো করতাম মনে মনে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি মন খারাপ হতো এই ভেবে যে, আমি যতখানি চাই আমার প্রতি মা ততখানি মনোযোগী নন।

আমার ভাই, জওহর তাঁর চোখের মণি—এ-কথা মা কখনও গোপন করবার চেষ্টা করতেন না। বাবাও যে তার জন্যে কম গর্বিত বোধ করতেন, তাকে কম ভালোবাসতেন তা নয়—হয়তো

তাঁর ভালোবাসা মা'র চেয়ে গভীরই ছিল। কিন্তু বুঝবার কিছু উপায় ছিল না। এত ওজন করা ব্যবহার তাঁর, এত নিরপেক্ষ যে, কেউ ধরতেও পারত না কাকে তিনি বেশি ভালোবাসতেন। তবু জওহরের সুখ্যাতি শুনে-শুনে আমার হিংসা হতো—মনে হতো ভালোই হয়েছে ও বিলেতে আছে।

স্বরূপ ভারি সুন্দর ছিল দেখতে—সবাই তাকে আদর দিয়ে নষ্ট করত। কিন্তু কেন জানি না, তাকে আমি মোটেই হিংসা করতাম না। আমি কেমন যেন বুঝে নিয়েছিলাম অমন সুন্দর যে হয় তাকে নিয়ে লোক একটু বাড়াবাড়ি করবেই। তাকে আমিও খুব ভালোবাসতাম।

ঘড়ির কাঁটার মতো বাঁধা-ধরা ছিল আমার শৈশব। প্রতিদিন সকালে অশ্বারোহণে শুরু হতো আমার দিন। ঘোড়ায় চড়তে এখনও আমার বেশ লাগে। বাবা খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারতেন, ঘোড়াও ছিল ভালো-ভালো। জওহর, স্বরূপ আর আমি, তিনজনেই প্রায় হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলাম—তিনজনেই ভালোবাসতাম ঘোড়ায় চড়তে। এখন অবিশ্যি আর চড়বার কোনো সুযোগই হয় না।

অশ্বারোহণের পর আমাদের মস্ত বাগানের এক কোণে পড়তে বসতাম গভর্নেসের কাছে। দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত এই ভাবে সারা সকালটা কাটত। খাবার পরে বিশ্রাম—ভারি বিরক্তিকর, তারপরে পিআনো শেখা। তারপর আবার লেখাপড়া দিয়ে শেষ। সন্ধ্যাবেলায় গাড়িতে বেড়াতে বেরুতাম। দুটি ছোট বর্মা ঘোড়ায় টানত গাড়ি। ঐ দুটি ছিল বাবার প্রাণ। ফিরে এসে, সন্ধ্যা কাটত একঘেয়ে রকমে। এখনকার মতো সিনেমা দেখা তখন চলন ছিল না। সিনেমা দেখতে পেতাম খুব কম। মাঝে মাঝে

সার্কাস কি মেলা দেখতে পেতাম—তাই যথেষ্ট। আজ আমার সাত-আট বছরের ছেলেরা দিশী, আমেরিকান ছবি সম্বন্ধে যা জানে আমি বারো বছর বয়সেও তা জানতাম না। খেলার সাথী পেতাম কখনও কখনও, তবে খুব কম। তাই নিজের মনে ভাবতাম আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম বাড়ির চারদিকে। অবাক হতাম জীবন দেখে, কিন্তু কাউকে বলতাম না কিছু। ছোটবেলাতেই শিখেছিলাম কি না, যে ছোটদের বেশি কথা বলতে নেই। লোকে দেখবে, খুশি হবে, ব্যস। বেশি কৌতূহলী হওয়া কি বেশি প্রশ্ন করা অসভ্যতার লক্ষণ, তাই নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজে পাইনি কখনও। মন কথায় টনটন্ করত, তবু চুপ ক'রে থাকতে হতো।

স্বরূপের যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন বাবা-মা ওকে নিয়ে বিলেত গিয়ে মিস্ হুপারকে আমাদের গভর্নেস রাখেন। মিস্ হুপার চমৎকার লোক, ভালো পরিবারের মেয়ে। পুরাতন ধারায় তিনি কড়া নিয়মের পক্ষপাতী, একটু এদিক-ওদিক পছন্দ করতেন না। স্বরূপকে সহজেই বাগ মানানো যেত। কিন্তু শুধু বাবার নয়, পূর্ব-পুরুষদের সমস্ত জেদ আমার উপর ভর ক'রে আমাকে রীতিমত একটি সমস্যা ক'রে তুলেছিল। কোনো শাস্তিতেই বশে আসার মেয়ে আমি নই। কিন্তু একটু বকুনিতেই ভারি লজ্জিত হতাম—মনে হতো, কেন ওদের কথা শুনলাম না। এমনি দুর্ভাগ্য যে, শাস্তি প্রায়ই পেতাম, বকুনি খেতাম খুব কম। তাই এই সঙ্গীহীন বালিকা হয়ে উঠল মুখচোরা মেয়ে। ভাবতাম, কেন লোকে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে না, কেন বাঁধা-ধরা পথ ভিন্ন কিছু শিখবার আর কোনোও উপায় নেই। বাপ মা প্রায় অপরিচিত, চিনতামই না। শুধু দিদির সঙ্গে মেশবার সুযোগ হতো রোজ।

আর ছিলেন গভর্নেস—তাঁকে কখনও ভালোবাসতাম, কখনও আবার দেখতেও পারতাম না।

আমার জীবনে প্রথম বড় ঘটনা হল দাদার ১৯১২ সালে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন। তাকে আমি চিনি না। তার বাড়ি আসায় উল্লসিত হয়েও উঠিনি; শুধু মনে ছিল কৌতূহল—কেমন হয়েছে সে। তার আসবার অনেক দিন আগে থেকেই বাবা-মা তাঁদের ছেলেকে, বংশধরকে, গৃহে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মা আর চেপে রাখতে পাচ্ছিলেন না তাঁর আনন্দ, উৎসাহ। প্রিয় পুত্রের জন্যে যেটি যেমন ক'রে সাজানো হয়েছে, সেটি তেমনি ঠিক আছে কিনা মা ছুটোছুটি ক'রে দেখে বেড়াতে লাগলেন। আনন্দে উজ্জ্বল মায়ের মুখ—তখন যে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তা আমার এখনও মনে আছে। সে রকম মুখ মায়ের আর কোনোদিনও দেখিনি। একটা সামান্য ছেলেকে নিয়ে মা যে কেন এত বাড়াবাড়ি কচ্ছেন ভেবে পেতাম না। ভারি বিরক্ত লাগত মাঝে মাঝে। আজকে খুব ভালো ক'রে বুঝেছি মায়ের তখন কেমন লাগত। দেখি কি, দিদিও উদ্‌গ্রীব হয়ে চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির মধ্যে। অসহ্য লাগছে আমার। মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললাম জওহরকে একেবারেই ভালোবাসব না।

সেই দিন এল। বাড়ির চাপা উত্তেজনায় আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। গ্রীষ্মকাল, আমরা মুসৌরি পাহাড়ে। ঠিক সময়ে বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দে, সবাই ছুটে গেল তাকে প্রত্যুদ্গমন করতে। একটি সুন্দর যুবক, দেখতে অবিকল মায়ের মতো, ঘোড়ায় চ'ড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে আমার মনটা কেমন দমে গেল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে প্রথমে মা-কে আলিঙ্গন ক'রে তারপর আমাদের সকলকে সে সাদর

সম্ভাষণ করলে। এই হঠাৎ-আসা ভাইটিকে ভালোবাসব-কি-বাসব-না একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছিলাম। অনেক ভাবের ভিড়ে আমি যখন ব্যতিব্যস্ত, জওহর আমাকে কোলে তুলে নিয়েই বললে, 'এই বুঝি ছোট্ট বোনটি ? এরই মধ্যে একজন লেডি হয়ে উঠেছেন দেখছি!' একটা চুমো খেয়েই যেমন হঠাৎ কোলে তুলে নিয়েছিল তেমনি হঠাৎ-ই নামিয়ে দিল, আর পরমুহূর্তেই আমার কথা একেবারে ভুলে গেল।

পরিচয়ের প্রথম ক'মাস মোটেই ভালো লাগল না। হাতে কিছু কাজ না থাকলেই জওহর আমাকে নিয়ে পড়ত আর ভারি জ্বালাতন করত। যা আমি করতে না চাইতাম, কি ভয় পেতাম, তাই করাত আমাকে দিয়ে। আবার কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ উপহারের বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে দিল আমার উপর, একেবারে ভুলিয়ে দিল। তাই চটেও থাকতে পারতাম না তার ওপর বেশিক্ষণ। তবু দূরে দূরেই থাকতাম, তেমন জম্‌তো না যেন তার সঙ্গে।

এত বড় বিশ্বযুদ্ধে আমার শান্ত, মাঝেমাঝে একঘেয়ে জীবনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দেখতাম মা সভা-সমিতিতে যেতেন ঘন ঘন ; সেখানে দেশী, বিদেশী মেয়েরা সৈন্যদের জন্যে এটা-ওটা বুনত। আর প্রায়ই যুদ্ধের কোনো খবর নিয়ে বাবা আর জওহর উত্তেজিত হয়ে উঠতেন।

জওহরের বিয়ে হল ১৯১৬ সালে। খুব জাঁক-জমক ক'রে বিয়ে হবে ; আয়োজন চলল বহুদিন ধ'রে। মণিকার, ব্যবসাদার, দরজি সারাদিন আনাগোনা করছে বাড়িতে, আর অসংখ্য মুহুরী নানারকম খুটিনাটি ব্যাপারের ব্যবস্থার খসড়া করেছে।

দিল্লীতে কনের বাড়িতে বিয়ে হবে। এক সপ্তাহ আগে, শুভদিন দেখে একশো বরযাত্রী নিয়ে, সুসজ্জিত স্পেশাল ট্রেনে, বরপক্ষ

যাত্রা করল। দলে দলে আরও বরযাত্রী দিল্লীতে এসে যোগ দিলেন। অনেকগুলি বাড়িতেও সব অতিথিদের জায়গা হল না দেখে বাবা প্রত্যেকের জন্যে তাঁবুর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে একটা তাঁবুর পত্তনি গ'ড়ে উঠল। তার নাম হল : 'নেহেরু বিবাহ-ক্যাম্প।'

দিল্লীতে তখন খুব শীত, কিন্তু আমার ভারি ভালো লেগেছিল। সারা ভারতে যত আত্মীয়স্বজন ছিলেন সকলে এলেন—আমারও খেলার সাথী জুটল অনেক ভাই বোন। রোজই একটা-না-একটা অভিযান করা হতো। এমনি ক'রে দশ দিন কাটিয়ে বরযাত্রীর দল ফিরে এল এলাহাবাদ। সেখানেও আবার আমোদ-আহ্লাদ চলল পুরোমাত্রায়।

জওহরকে বরের বেশে সুন্দর মানিয়েছিল, আর কনে হিসেবে কমলার মতো কনে আমি কোনোদিন দেখিনি। ১৯১৭ সালে তাদের একমাত্র মেয়ে ইন্দিরা জন্মাল।

১৯১৭ পর্যন্ত জীবন ছিল ঘটনা-বৈচিত্র্য-বিহীন। সেই বছর আমার গভর্নেস তাঁর একটি ইংরেজ বন্ধুর প্রেমে পড়ে, তাড়াতাড়ি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন সব ইংলণ্ডে ; তাই বাবা তাঁকে 'দান' করতে রাজী হলেন। নীত-কনে হব আমি, মনে ভারি আনন্দ। আবার দুঃখও হল গভর্নেসকে ছেড়ে দিতে হবে ব'লে। তাই তাঁর সব দোষ ভুলে গেলাম—শুধু মনে রাখলাম এতদিন ধ'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং যত্ন। বারো বছর ধ'রে আমাদের সঙ্গে থেকে, তিনি বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিলেন। তাই পরস্পরের স্নেহের বন্ধনও হয়েছিল দৃঢ়।

বিয়ের দিন সকালে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। সবই বেশ সুষ্ঠু

ভাবে নিষ্পন্ন হল এবং বাবা তাঁর জন্যে যা করেছেন তাতে তিনি খুব খুশি হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন মধু-চন্দ্রিকায়। আমার জীবন হয়ে উঠল দুর্বহ। ছেলে বয়েসে এই আমার প্রথম দুঃখ। ছোটবেলাকার মন ভাঙা—শিগগিরই জুড়ে গেল। তাঁর অভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। নতুন-পাওয়া স্বাধীনতায় মোটামুটি যা-খুশি তাই করতে পেয়ে দিনকয়েকেই বেশ খুশি হয়ে উঠলাম। নিজের ভার এসে পড়ল নিজের হাতে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো স্কুলে গিয়ে পড়তে আমার ভারি ইচ্ছে—বাবার কিছুতেই মত হয় না। একা-একা আভিজাত্য নিয়ে গভর্নেসের কাছে পড়াই ঠিক। তখনকার দিনে তরুণীদের তিনটে গুণের প্রয়োজন ছিল—পিআনো বা ঐ জাতীয় কিছু বাজাতে পারা, কথা বলতে পারা আর সমাজে মিশতে জানা। দিদি কখনও স্কুলে যায়নি, বাড়িতেই পড়াশুনো করেছে। আমার ধারণা, সে কখনও যেতে চায়নি। কিন্তু আমি যে যেতে চাই! গভর্নেসের বিয়ে হয়ে যাবার পর বাবার মত করাবার খুব চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমে তিনি বললেন, 'না, আর একজন গভর্নেস রাখা হবে।' কয়েকজন এলেন; সৌভাগ্যবশতঃ কেউই থাকলেন না। শেষে বাবা আর কি করেন, মত দিলেন। আমি স্কুলে গেলাম। ঠিক উপযুক্ত স্কুলটিই ঠিক করা হল আমার জন্যে—ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে অতি ভদ্র একটি জায়গা। আমি যখন গেলাম তখন বেশির ভাগই সেখানে ইংরেজ ছেলেমেয়ে। পরে অনেক ভারতীয়েরা এসে যোগ দিয়েছিল।

এই নতুন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি।

খেলাধুলোয় পড়াশুনোয় সময় ঠাসা—আর একা লাগত না কখনও। এত ভালো লাগত এ-জীবন, মনে হতো এ-বুঝি সত্যি

নয়। সেই স্কুলে পড়ার দিনগুলি আমার শৈশবের দিনের আনন্দ। সেই আনন্দ কয়েক বছর পরেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল।

এমনি করে সুখে শান্তিতে, আমার সেই এত-ভালো-লাগা বাড়িতে আমি বড় হয়ে উঠলাম।

এমনি করে সুখে শান্তিতে, আমার সেই এত-ভালো-লাগা বাড়িতে

২

‘এখন যদি তখন হতো, আহা !’—কোল্‌রিজ্‌

মায়ের সুকুমার স্বাস্থ্য নিয়ে আমাকে দেখা সম্ভব হতো না, তাই গভর্নেস চলে যাবার পর, স্বরূপই আমার দেখাশোনা করত। তত্ত্বাবধানে নিষ্ঠা তার ছিল না ; আমিও বেশির ভাগ সময় যা ইচ্ছে তাই করতাম। এতে তারও কষ্ট হতো কম, আমারও লাগত ভালো। আমরা দুজনেই কবিতা ভালোবাসতাম। বহু স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, বাগানে তার কবিতাপাঠে মগ্ন হয়ে কাটিয়েছি। অতি বিরল স্নেহের বাঁধন গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে—সেই সব দিনে স্বরূপ ছিল আমার বন্ধু, পরিচালক, উপদেষ্টা।

১৯২০ সালে ত্রুটিবিহীন কাশ্মিরী ধরনে মহাসমারোহে আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেল। তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হচ্ছিল এলাহাবাদে। সেই সব সভ্য এবং আরও অসংখ্য অতিথি বন্ধুবান্ধবে বাড়ি ভ'রে গেল। আমার দিনগুলি কাটছিল উজ্জ্বল হয়ে—সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়—কিছু করা না-করার ভার আমার উপর নেই। স্বরূপ চলে যাবে ব'লে দুঃখ একটু না হচ্ছিল যে তা নয়, কিন্তু বিয়ের ধুমধামে আনন্দও হচ্ছিল খুব।

এই সময়ে আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিই। মাংস আমার খুব প্রিয়। একদিন খেতে বসেছি, গান্ধীজীর সচিব মহাদেব দেশাই এসে উপস্থিত। আমার সামনে অত রকমের মাংস দেখে তাঁর তো চক্ষুস্থির ! তিনি সেইখানেই নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমাকে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন। আমি তো সহজে ছাড়বার পাত্রী নই, আর

তিনিও দেখা হলেই আমাকে ধরে পড়তেন। এই রকম চলল দিনের পর দিন। হঠাৎ বিয়ের মাঝখানেই একদিন মাংস ছেড়ে দিলাম। সকলেই খুব ক্ষুণ্ণ হলেন। শুধু মা খুব খুশি হলেন। তিনি মাংস দেখতে পারতেন না, পারতপক্ষে ছুঁতেন না পর্যন্ত। অসুখের সময় কোনো-না-কোনো আকারে তাঁকে মাংস খাওয়ানো হতো জোর করে। তারপর তিন বছর ইচ্ছে হলেও মাংস ছুঁইনি। একবার বড়দিনে আত্মীয় স্বজনদের কাছে সপ্তাহ-খানেক কাটাতে গিয়ে, তাদের সকলের মাংস খাওয়া দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। বসে গেলাম।

স্বরূপ চলে যাওয়ার পর বড় একা-একা লাগছিল। অবিশ্যি কমলা-বৌদি ছিল—সেও স্বরূপের বয়সী। তার অভাব খানিকটা পূরণ করল বৌদি। এই সময় বাবার সঙ্গেও পরিচয় হল একটু গভীরতর। স্বরূপের অনুপস্থিতি তিনি ভরে দিতে চাইলেন। যেই তাঁকে বেশি ক'রে জানতে শুরু করলাম, বেশি ক'রে ভালো-বাসতে শুরু করলাম অমনি এল তাঁর প্রথম কারাবাসের দিন; আমাদের সংক্ষিপ্ত সাহচর্যে পড়ল আকস্মিক ছেদ।

বাবার অনুরোধে কি-সব আলোচনা করবার জন্যে ১৯২০ সালের প্রথমে যখন গান্ধীজী এলাহাবাদ আসেন তখন তাঁকে প্রথম দেখি। 'বাপুজী' সম্বন্ধে অনেক শুনেছিলাম; আমার কল্পনায় তিনি রূপকথার মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। আমার তখন বয়েস কম, তাঁকে সবটা বুঝিনি। তাঁর রকম-সকম অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তাঁকে প্রথম দেখে মনে তেমন কিছু হল না। আমি ভেবেছিলাম, দীর্ঘ বলশালী দেহ, দীর্ঘ পদক্ষেপ, অগ্নিপ্রভ দৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হবেন একজন। তার বদলে দেখলাম শীর্ণ, ঈষৎ নুব্জ একটি লোক আসছেন, হাতে লাঠি। ভারি শান্ত, বিনয়ী—

যেন মনে হয় অর্ধভুক্ত। ভারি হতাশ হয়ে গেলাম। অবাক লাগল—পর্বতপ্রমাণ বাধা-ব্যতিক্রম অতিক্রম ক'রে আমাদের দেশকে পরাধীনতা-মুক্ত করবেন এই ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি?

জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর নৃশংসতার কাহিনী অনেক শুনেছি, পড়েছি। ছেলেমানুষ আমি, প্রতিশোধ নিতে চাইতাম হিংসায়, রক্তপাতে। যখন বাপুর অহিংসার কথা শুনলাম, মনে হল এ-সব কবি-কল্পনা। বিশ্বাসই করতে পারিনি যে একটা জাতি এই আদর্শ মেনে চলতে পারে। তার উপর আমার প্রকৃতিতে একটু বেয়াদবী চিরকালই আছে। সবাই যখন তাঁকে মানছে, তাঁর ক্ষুদ্রতম আদেশটুকুও যখন সকলে পালন করতে ব্যস্ত, তখন আমি হয়ে রইলাম উদাসীন। মা এতে ভারি কষ্ট পেলেন। মনে মনে বাপুকে আমি ভালোবাসতাম, ভক্তি করতাম, কিন্তু অন্যদের মতো তাঁকে ঋষি কি অতিমানুষ ব'লে ভাবতে পারতাম না।

যতই তাঁকে দেখি ততই আকৃষ্ট হই। কখনও মনে হতো তিনি এ-জগতের লোকই নন, তবু তিনি এইখানেরই, ভালোবাসেন এই পৃথিবীকে। মৃদু চোখে মৃদু হেসে তিনি যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্ত জয় করেছেন, তেমনি আমাকেও জয় ক'রে নিলেন—শুধু সেইক্ষণের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে। সত্যি ক'রে একবার তাঁর অনুগত হলে, সে-আনুগত্য আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

১৯২০ সালে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু হল। তার আঘাতে শুধু আমাদের পরিবারের নয়, আরও অসংখ্য লোকের জীবনের ধারা গেল বদলে। আমারও গেল। আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল ইংরেজের স্কুল বয়কট করবার কথা। নিজের পড়াশুনো আর নিজের ছোট্ট জগত নিয়ে এত মগ্ন ছিলাম যে আমাদেরই বাড়িতে যে এত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তা লক্ষ্যই করিনি। তাই বাবা যখন

একদিন ডেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন স্কুল ছাড়তে হবে তখন সে-আঘাত রূঢ় হয়েই বাজল। স্কুল ভালো লাগত, অনেক বন্ধু ছিল সেখানে। ছাড়ার কথায় দুঃখ হলেও বুঝলাম স্কুল ছাড়াই একমাত্র কর্তব্য। তখন অন্য স্কুলে যাওয়ার সুবিধা হল না। বাড়িতে মাস্টার এসে পড়াতে লাগলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে মন অস্থির। কিছুই করবার নেই। যদিও চারদিকের জীবনে তখন অদ্ভুত দ্রুতগতি। সেই ঘটনাস্রোতের ঘূর্ণিতে ধরা পড়লাম আমিও। সেই স্রোতে বদলে গেল সারা দেশের রূপ।

প্রতিদিন পরিবর্তনের উত্তেজনা। কাল কি ঘটবে জানি না। আমার সেকালের একঘেয়ে জীবন দিন-দিনান্তরের ঘটনায় বদলাতে লাগল। জওহর চাইল গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দিতে। বাবা ঝাঁপ দেবার আগে চারদিক ভেবে-চিন্তে দেখে নিতে চাইলেন। জওহর মনস্থির করে নেমে পড়ল সত্যাগ্রহ আন্দোলনে, কঠিন মানসিক দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে। তার মতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ-ই স্বাধীনতার একমাত্র উপায়। তবু বাবার সম্পূর্ণ-মত সহজে হবার নয়। অনেক চিন্তা করেও বাবা গান্ধীজীর ভাবধারা স্বীকার করে নিতে পারলেন না—এই প্রস্তাবিত আন্দোলনও তাঁর যেন তেমন পছন্দ হল না। তিনি বললেন, 'জেলে গিয়ে কি লাভ হবে? জওহরই বা গ্রেপ্তার হতে চাইছে কেন?' জেলে তীর্থযাত্রা তখনও শুরু হয়নি। জেলের কষ্ট জওহরকে সইতে হবে—এ-ধারণাই তাঁর কাছে বেদনাদায়ক! জওহরকে তিনি এত গভীর ভালোবাসতেন।

জওহর আর বাবার মনে দ্বন্দ্বের আর শেষই হয় না। দীর্ঘ আলোচনার মাঝে মাঝে চড়া-কথাও শুনতে পেতাম। দিন-রাত্রি চলেছে গ্লানির মধ্যে দিয়ে—দুজনে চেষ্টা করছেন দুজনকে

বোঝাতে। জওহরের বাপুকে অনুসরণ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বাবা ক্লিষ্ট। পরে জানতে পেরেছিলাম, বাবা মেঝেতে শুয়ে দেখতেন কেমন লাগে—জেলে যে জওহরকে মেঝেতে শুতে হবে! সকলের বড় খারাপ লাগছিল পিতা-পুত্রে এই অন্তহীন বিতর্ক। রাষ্ট্রনীতি আর বিতর্ক এঁদের মধ্যে বিরোধ আনবে, কমলা আর মা এতে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছিলেন। বাড়ির আবহাওয়া তীব্র, পাছে কারও কোনো কথায় বাবা চটে ওঠেন কি জওহর বিরক্ত হয়!

বাবাকে বহুল পরিমাণে জওহরের মতানুগামী করল পাঞ্জাবের ঘটনাবলী আর জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর শোচনীয় দৃশ্য। আমাদের বাড়ির পিছনে কাঠ-কয়লা ইত্যাদি রাখবার বহু ঘর ছিল। কাঠের ঘরটায় একটা বিরাট গোখরো সাপ থাকত। প্রথম থেকেই আমি ওটাকে দেখে আসছি। কাউকে কিছু বলত না সে ; গভীর রাত্রেও চাকরেরা নির্ভয়ে সে-ঘরে যেত। কখনও দেখা যেত সাপটা বাগানে কি ঐ ঘরগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও লক্ষ্যই নেই সেদিকে। সাধারণের মনের কুসংস্কার, এই বাস্তু-সাপ যতদিন বাড়িতে থাকবে, ততদিন গৃহস্থের ঐশ্বর্যও থাকবে অক্ষুণ্ণ হয়ে।

১৯২০ সালে বাবা আইন-ব্যবসায় ছেড়ে দেবার ঠিক আগে, নতুন একটা চাকর একদিন সন্ধ্যায় দেখতে পেল সাপটাকে। রীতিমতো ভয় পেয়ে, কয়েকজনের সাহায্যে সাপটাকে সে মেরে ফেলল। পুরানো চাকরেরা, তার সঙ্গে মা, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন এই হত্যায়। তারপরই শুরু হল পরিবর্তন। চাকর-বাকরদের মতে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ এই বাস্তু-সাপ বধ।

অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেওয়া মানে এই যাট বছর বয়সে বাবার সমস্ত অভ্যস্ত জীবনধারার পরিবর্তন। এর ফলে শুধু যে

কর্মক্ষেত্রের এবং রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে তাই নয়, আজীবনের বান্ধবেরা পর্যন্ত—যাঁরা বাবা কি বাপুর সঙ্গে একমত নন, তাঁরাও সরে যাবেন দূরে। অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করতে হবে—যে-জীবন তাঁর এ-পর্যন্ত শুধু সুখেই কেটেছে। কিন্তু একবার বাবা যেই বুঝলেন এই-ই সত্যপথ, তখন তিনি দ্বিধাহীন হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন, ফিরেও তাকালেন না পিছনে।

দিনে দিনে বাবা আর জওহর রাষ্ট্রনীতিতে আরও ডুবে যেতে লাগলেন। জীবন যে বাড়িতে ছিল মসৃণ, হয়ে উঠল বন্ধুর। বহু কংগ্রেসকর্মী বহু জায়গা থেকে আসতে লাগলেন, কয়েক দিন থেকে আলোচনা করবার জন্যে। সভার পর সভা—লোক আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। বহু লোক আসার ব্যাপারে আমি ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত—কিন্তু তাঁরা ছিলেন অন্য ধরনের লোক। তাঁরা আসতেন মোটরে, সুন্দর-সুন্দর ঘোড়ার গাড়িতে, পরস্পরকে পরস্পরের ঐশ্বর্য দেখানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরেই বেশ কয়েকজন বড়লোক বন্ধু স'রে গেলেন দূরে; আসতে লাগলেন পরিপাটি-বেশে সজ্জিত ধনীবৃন্দের বদলে খদ্দর-পরা, সরল, নিরহংকার নারী-পুরুষ। তাঁদের প্রত্যেকের মনে অজেয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য সাহস—দেশকে স্বাধীন করতেই হবে—প্রয়োজন হলে প্রাণ সমর্পণ ক'রে।

১৯২১ সালে ব্যাপার ঘনিয়ে উঠল; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পাইকারী ধরপাকড় শুরু করল। প্রস্তুতই ছিলেন আমাদের কর্মীরা; তাঁরা হাজারে হাজারে নেমে পড়লেন। তখনও পর্যন্ত জেল বলতে লোকে বুঝত দূরবর্তী, অজানা, অস্পষ্ট কি-একটা! দুদিনেই সেই জেল এই কর্মীদের দ্বিতীয় গৃহ হয়ে উঠল। প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্ এলেন

ভারতবর্ষে, এলাহাবাদেও তাঁর আসবার কথা। তাঁর আসবার দিন কয়েক আগেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবাকে ব'লে পাঠালেন, 'আপনার বাড়িতে লোক আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তোরণ বন্ধ করতে হবে।' বাবা উত্তরে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর নিজের সম্পত্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের নেই; তিনি আইন-সঙ্গত ভাবে যা উচিত মনে করবেন তাই করবেন। অবশ্য অসহযোগী হিসেবে তিনি দেখবেন যাতে এলাহাবাদে অবস্থান কালে প্রিন্স অফ ওয়েল্সের কোনো অনিষ্ট না হয়। এই আশ্বাসের পুরস্কার-স্বরূপ বাবাকে গ্রেপ্তার করা হল। একদিন সন্ধ্যায় শুনলাম সমস্ত নেতা এবং কর্মীদের একধার থেকে ধরা হবে।

১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বরের সেই সন্ধ্যায় বাবা আর জওহরকে গ্রেপ্তার করবার পরওয়ানা নিয়ে প্রথম পুলিশ এল আনন্দ-ভবনে। তারপর থেকে তারা প্রায়ই এসেছে—হয় আমাদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে অথবা কাল্পনিক নিষিদ্ধ কাগজ-পত্রের সন্ধানে। আর বারে বারেই তাদের আসতে হতো অর্থদণ্ডের জন্যে আমাদের গাড়ি বাজেয়াপ্ত করতে; ফলে বহু বাড়তি আসবাবপত্র থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেলাম!

পুলিশের অভ্যাগমে বাড়িটা বেশ স্পন্দিত হয়ে উঠল। পুরানো চাকরেরা চটে উঠে বলল, 'পুলিশদের মেরে বাড়ির বার ক'রে দেব।' কিন্তু মা তাদের ধমক দিয়ে থামালেন। বাবা আর জওহর ছাড়া আর সকলেই এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে একটু মুষড়ে পড়ল। আমাদের আপনজনেরা কারাগারে—এ ভারি বিশ্রী লাগে। তখনও জানতাম না—কত কষ্ট আছে কপালে! গত কয়েকমাসের অবিরাম পরিবর্তন মায়ের কাছে একটা অবোধ্য দুঃস্বপ্নের মতো—তার উপর

এল এই কঠিনতম আঘাত। স্ত্রী হিসেবে তিনি যত নির্ভীক, মা হিসেবে তার চেয়েও বেশি। কাউকেই তিনি বুঝতে দিলেন না তাঁর সেই মুহূর্তের বেদনা। বাবা আর জওহর প্রস্তুত হয়ে বিদায় নিয়ে পুলিশের গাড়িতে সদর জেলে চ'লে গেলেন। মা আর কমলা স্বামীদের হাসিমুখেই বিদায় দিলেন ; মুখে তাঁদের সাহসের হাসি, হৃদয়ে শূন্য বিষাদ। গাড়ি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, আমরা ভিতরে এলাম। এক মুহূর্ত আগে যে-বাড়ি ছিল আনন্দ-মুখর একেবারে নিস্তব্ধ নিরানন্দ হয়ে গেল।'

১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাবা আর জওহরের বিচার হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। সরকার পক্ষের যে এ্যাডভোকেট মামলা চালাবেন তিনি, একজন ভারতীয়, বাবার পুরানো বন্ধু এবং সহকর্মী—তাঁর সাহস হল না মামলার পরিচালনাভার প্রত্যাখ্যান করতে বা চাকরি ছেড়ে দিতে, তবু মামলা চালাতে গিয়ে এত ভীত, এত লজ্জিত হতে কাউকে দেখিনি। বাবার দিকে মুখ তুলে তিনি তাকাতেই পারলেন না। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না তাঁর—এমন অবস্থা। তার আগে প্রতিদিন বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে—বন্ধুর সকল রকম আতিথ্য, অনুগ্রহ তিনি গ্রহণ করেছেন। বাবার গ্রেপ্তারের পর এ-সব কথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁদের ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। বিচারের পর বাবা এই বাণী পাঠালেন তাঁর সহকর্মীদের, 'আপনাদের মধ্যে থেকে সকলের যথাসাধ্য সেবা ক'রে এবার আমার কারাগারের মধ্যে দেশ-মাতৃকার সেবা করার পালা। মনে আমার স্থির বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার মধ্যে আমাদের দেখা হবে। বিদায়ের সময় একটি কথা শুধু বলছি—স্বরাজ না আসা পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। শ'এ শ'এ হাজারে হাজারে আপনারা

স্বেচ্ছাসেবক হোন। বর্তমানে ভারতের একমাত্র মুক্তি-মন্দির কারাগারে তীর্থযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, দিনে দিনে সেই মন্দির যেন ভরে যায় এ-দেশের লোকে—বিদায়।'

এই হল নতুন জীবনের শুরু—অনিশ্চিত, বেদনায় ভরা আত্ম-ত্যাগের জীবন। এই মহান কর্তব্যের যুদ্ধে সব কিছু গেলেও তো ক্ষতি নেই। বাবা আর জওহরকে ছেড়ে থাকায় আমাদের ক্ষোভ, দেশের জন্যে এঁদের আত্মত্যাগের গৌরবে বিলীন হয়ে গেল।

এঁদের ধরার পর পুলিশের শুভাগমন প্রায়ই হতো। কিছুদিন অন্তর অন্তর আমাদের বাড়িটাকে একবার শুঁকে যাওয়া ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। আর এসেই অর্থদণ্ডের পরিবর্তে কোনো-না-কোনো জিনিস টান মেরে নিয়ে যেত। একবার মনেও হতো না তাদের যে পাঁচশো টাকার বদলে তারা কত হাজার টাকা দামের কার্পেট তুলে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আরও কত কি। প্রথম প্রথম রাগে জ্বলে যেতাম। শেষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

বাবা এবং জওহরের কারাবাসের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল আমেদাবাদে। গান্ধীজী মাকে আর কমলাকে অনুরোধ করলেন সেই অধিবেশনে যোগ দিতে। মা, আমি, কমলা আর তার ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরা—সব চললাম। সম্পর্কীয় বোনদেরও অনেকের স্বামী জেলে। তারাও চলল আমাদের সঙ্গে। থার্ডক্লাশে ভ্রমণ এই প্রথম। পরে অভ্যাস হয়ে গেলেও প্রথম অভিজ্ঞতাটা বিচিত্র। দীর্ঘ ভ্রমণ; স্বাচ্ছন্দ্য নেই একটুও; তবু বেশ লাগছিল আমার। একটা শিক্ষা হল। আর এই প্রথম দেখলাম জনগণের আর কংগ্রেসকর্মীদের গান্ধীজীর প্রতি কি গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। যত ভোরেই হোক বা যত রাতেই হোক, প্রত্যেক স্টেশনে

আমাদের কামরার সামনে বিপুল জনতা—ফুলে মালায় ভরিয়ে দিচ্ছে আমাদের, খাবার দিচ্ছে অজস্র ; অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ে তারা জানাচ্ছে যে তারা বোঝে নেতারা তাদের স্বরাজ এনে দেবার জন্যে কত স্বার্থত্যাগ করছেন। তাদের বিশ্বাস, তাদের ভালোবাসা—আমাকে অবাক ক'রে দিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে আমরা বিদেশীর শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হতে তাদের সাহায্য করছি। অকুণ্ঠ চিত্তে, একান্ত বিশ্বাসে একটি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তির উপর তারা ছেড়ে দিয়েছিল তাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার—সে-ব্যক্তিটি গান্ধীজী।

পৌঁছুলাম বহুবিশ্রুত সবরমতী আশ্রমে। এই ভ্রমণ কখনও ভুলব না। পরম স্নেহে গান্ধীজী আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, তারপর বাবার আর জওহরের স্বাস্থ্যের সংবাদ নিয়ে একজনকে বললেন আমাদের ঘর দেখিয়ে দিতে। একটি ছাত্রাবাস-জাতীয় জায়গায় আমাদের আবাস। শূন্যপ্রায় আড়ম্বরহীন ঘর, আরাম ক'রে থাকা যায় না। একটা বড় ঘরে আমরা সকলে ঘুমতাম। মায়ের কেবল আলাদা ঘর একখানি। ডিসেম্বর মাস, খুব শীত। তবু সকাল চারটায় উঠে প্রার্থনায় যোগ দিয়ে, স্নান ক'রে নিজেদের কাপড়-চোপড় নিজেরা কেচে, বাপুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে হতো। তারপর সারাটা দিন যা খুশি তাই ক'রে বেড়াই। প্রথম কয়েকদিন সকালে উঠতে বেশ কষ্ট হলেও সবরমতীর তীরে প্রার্থনা ভারি সুন্দর লাগত। একদিনও অনুপস্থিত থাকতে ইচ্ছে করত না।

চারদিকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট কয়েকটি কুটির নিয়ে আশ্রম। কেন্দ্রের প্রধান কুটিরটি বাপুর। অন্যগুলিতে থাকেন মহাদেব দেশাই, গান্ধীজীর ভাইপো-ভাগ্নেরা এবং অন্য কর্মীরা। কয়েকটি

পরিবার একখানি কুটির নিয়ে থাকতেন। মেঝের উপর শোওয়া আমার পছন্দ নয়, তবু অভ্যাস হয়ে গেল। আহার্য অত্যন্ত শাদাসিধে, বড় বেশি রকম সাদাসিধে। কোনোরকম মশলা দিয়ে একটুও সুস্বাদু করবার চেষ্টা নেই—শুধু সেদ্ধ করা। প্রথমে খেতে ভারি কষ্ট হতো। আমার তো ক্ষিদে কখনই যেত না। কেবল ভাবতাম বাড়ি গিয়ে কবে পেট ভরে খাব।

নিজের হাতে কাপড় কাচতে হতো আশ্রমে। মোটা খদ্দর নিজের হাতে কাচা বড় সহজ কথা নয়। আর তখন আমাদের পরনের শাড়িগুলো দেখলে ভয় লাগত—এত মোটা! মা আর তাঁর সম্পর্কীয় এক বয়স্থা বোনের কাচাকুচির কাজে সাহায্য করবার জন্যে একটি ছোট ছেলেকে দেওয়া হয়েছিল। বাকি সকলকে সব নিজে হাতেই করতে হতো। প্রথমে কেউই সুবিধা করতে পারত না, তবে বাড়ি ফিরে আসার আগে আমাদের কেউ কেউ বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছিল সব কাজে। আমার অবিশ্যি কোনো উন্নতিই হয়নি।

দিন পনেরো আমেদাবাদে থেকে আমরা বাড়ি ফিরলাম। ফিরে আসতে পথে সেই একই অভিজ্ঞতা। আশ্রমে বাপুর ঘনিষ্ঠ দীর্ঘ সাহচর্য একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সে আমি কোনোদিন ভুলব না। অনেকেই আসত বাপুর কাছে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্যে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না বাপু কেন এই সব ব্যক্তিগত সমস্যায় পরামর্শ দিতেন। পরামর্শ নিতে আসাটাই তো তাদের অন্যায়। তাঁর কথামতো ফল যদি না ফলে দোষ তো দেওয়া হবে বাপুকেই।

বাবার আর জওহরের ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলেও, আমাদের ফিরে আসার কিছুদিন পরে, মাস তিনেকের মধ্যেই

জওহরকে মুক্তি দেওয়া হল। তবে বেশিদিন মুক্তি তার সইল না ; ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আবার সে ফিরে গেল জেলে। তারপর থেকেই দেখছি, জেলে যাওয়া আর আসা আমাদের পরিবারের বেশির ভাগ লোকেরই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এইভাবে চলল জীবন। বাড়িতে পড়াশুনো করতাম। আর, জেলে প্রায়ই কারো-না-কারো সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোথাও আমরা যেতাম না। ১৯২৩ সালে সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পেল। বাবা আর জওহর আবার এলেন আমাদের মধ্যে, আর এত দিনের নিস্তব্ধ বাড়ি আবার সংক্রামক হাসিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মনে হল যেন আনন্দ-ভবনে সেই পুরাতন শান্ত জীবন আবার ফিরে এসেছে।

৩

'খেলাঘরে শিশু ছবি নিয়ে করে খেলা,
পৃথিবী তো তারই কামনার মাপে গড়া ;
প্রদীপ-আলোকে কত বড় মনে হয়,
পিছনে-তাকানো স্মৃতিতে কি ছোট ধরা !'
—চার্লস বদলেয়র

নাভা রাজ্যে ১৯২৩ সালে জওহর গ্রেপ্তার হল। ছাড়া পেয়েই বাড়ি এসে পড়ল ভীষণ টাইফয়েডে। মাসখানেক পরে ভালো হয়ে উঠলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

জেল প্রবাসের বিরাম হল একটু। পরস্পরের সাহচর্যে জীবন একটু সুস্থ হয়ে উঠল। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের শেষে বাবা আর সি. আর দাস-এর মনে স্বরাজ্য-পার্টির সূচনা হল ; পার্টির প্রথম সভা হল আনন্দ-ভবনে। সি. আর দাস সভাপতি আর বাবা সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৫ সালের জুন মাসে সি. আর. দাস মারা গেলে বাবা সভাপতি হলেন স্বরাজ্য-পার্টির। সি. আর. দাস বাবার শুধু সহকর্মী ছিলেন না, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে বাবার মনে গভীর আঘাত লাগে। অ্যাসেমব্লিতে বিপক্ষ দলের এবং স্বরাজ্য-পার্টির নেতা হিসেবে তাঁর সুনির্দিষ্ট কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কতগুলি সাংস্কারিক কার্যের প্রতি গভর্নমেণ্টের মনোভাবে পার্টির নীতি অনুসারে তিনি ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে সদলবলে বেরিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে তাঁর ভাষণ অপূর্ব হয়েছিল। সেই সময়ে মাঝে মাঝে দিল্লী

গিয়ে আমি অ্যাসেমব্লির অধিবেশনে উপস্থিত থাকতাম। শাদা খদ্দরের পোশাকে বাবাকে এত অভিজাত, এত প্রতিষ্ঠাবান দেখাত যে আমার ভারি গর্ব হতো মনে মনে। অধিবেশনের সময়ে শক্ত শক্ত সমস্যা এবং প্রশ্নের তাঁর সমাধান দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। পার্টির সিদ্ধান্ত থেকে একটু নড়-চড় হবার সম্ভাবনা হলেই তিনি কঠিন হয়ে উঠতেন। সেখানে কোনো আপোষ তিনি সইতেন না। কখনও কখনও দেখছি কোনো ভুল বা অশোভন দুর্বলতার জন্যে তিনি তাঁর সহকর্মীদের তীব্র ভৎ´সনা করছেন। যারা তাঁকে বুঝত, জানত, এই একটু স্বৈরাচার সত্ত্বেও তারা তাঁকে ভালোবাসত, গভীর শ্রদ্ধা করত। আর তাঁর শত্রুরা কাছে ঘেঁষত না ভয়ে।

উষ্ণ বিতর্কের সময় অ্যাসেমব্লির অধিবেশন আমার বেশ লাগত। আর মাঝে মাঝে বাবা যখন অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়াতেন এবং মা উপস্থিত থাকতেন না, তখন গৃহিণীপনা করতে আমার ভারি ভালো লাগত।

আমার খুড়-শ্বশুর বিখ্যাত মিল-মালিক কস্তুরভাই লালভাই তখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য। আমার স্বামী রাজা তাঁর ওখানে প্রায়ই থাকতেন। রাজা বলেন যে ঐখানে একদিন আমাকে দেখেই তিনি ঠিক করে ফেলেন যে আমাকে বিয়ে করবেন। আমার কিন্তু মনেই নেই কবে দেখা হয়েছিল। রাজা ভারি চটে যান এই-কথায়। বিয়ের আট বছর আগেই যে রাজা আমাকেই বিয়ে করা স্থির করে ফেলেছিলেন এটা ভাবতে আমার ভারি ভালো লাগে।

১৯২৫ সালের শেষাশেষি কমলার কঠিন অসুখ হল। কয়েক বছর ধরেই তার অসুস্থতায় বাবা-মা এবং জওহর উদ্বিগ্ন ছিলেন।

ডাক্তারেরা বললেন চিকিৎসার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে ইন্দিরা আর কমলাকে নিয়ে জওহর ইউরোপ যাত্রা করল। তাদের সঙ্গে স্বরূপ আর তার স্বামী রঞ্জিৎও গেলেন। বহুদিন আগেই তাদের ঠিক করা ছিল এই অবকাশে তারা যাবে।

সেই বছর জুন মাসে বাবার সঙ্গে আমিও ইউরোপ যাব, ঠিক হল। বহুদিন ধরে ছুটি তিনি উপভোগ করেননি। এই অক্লান্ত কাজের চাপে একটু বিশ্রাম, একটু পরিবর্তন তাঁর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুদিন আগে-নেওয়া একটা জরুরী মামলার জন্যে যাওয়া স্থগিত রাখতে হল কারণ মামলার দিন আর স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। যখন তিনি ব্যবসায় ছাড়েননি সেই সময় নেওয়া কেসটা। কোর্টে আবার যেতে তাঁর একেবারেই ভালো না লাগলেও, পুরনো মক্কেলদের পরিত্যাগ করতে পারলেন না।

বাবা প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেওয়ার পরেও অনেক পুরনো মক্কেল এসে বলতেন, 'এই আমার কেসটা শুধু ক'রে দেন।' বাবা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করতেন। তাদের মোটা মোটা টাকার প্রলোভন তাঁকে টলাতে পারত না। একবার একটা কেসের জন্যে একজন বাবাকে লক্ষটাকা দিতে নিয়ে এল। টাকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কি রে বেটি, নেব কেস?' কি উত্তর দেব ঠিক করতে না পেরে আমি একটু দ্বিধা করছিলাম। জানতাম বাবার হাতে টাকা নেই; টাকাটা পেলে সুবিধেই হবে। তবু নেওয়া যেন ঠিক হবে না। আমি তাই শুধু বললাম, 'না বাবা নেওয়া বোধ হয় ঠিক হ'বে না।' বাবা গর্বভরে আমার হাত চেপে ধ'রে মক্কেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি করি বলুন, মেয়ে পর্যন্ত আপত্তি কচ্ছে।' পরে মনে হয়েছিল বাবা ঐ প্রশ্ন ক'রে

জানতে চেয়েছিলেন তিনি যে-রকমটি চান আমি সেই রকম হচ্ছি না প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কন্যা হবার অনুপযুক্ত হচ্ছি। আমি একা কখনও কোথাও যাইনি। বাবা তাই মুশকিলে পড়ে গেলেন—আমাকে একা ইউরোপ যেতে দেবেন, না টিকিট ফিরিয়ে দেবেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।' আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম। বাবার সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম, তাই একা যেতে মন চাইছিল না। আবার ভাবছিলাম—এই সুযোগ যদি গ্রহণ না করি তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আর সুযোগই পাব না। তাই ঠিক করে ফেললাম—যাব। এখন মনে হয় ভালোই করেছিলাম।

আমাকে এই স্বাধীনতা দেওয়ায় মা বাবার উপর বড় চটে গেলেন। একজন যুবতীর পক্ষে একা অপরিচিত দেশে যাওয়া তাঁর মতে অত্যন্ত অন্যায়। তিনি আমাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে দুঃখ দিতেও ইচ্ছে হচ্ছিলো অথচ যাবার ইচ্ছেও ছিল প্রবল। বহু তর্ক-বিতর্কের পর জীবনে এই প্রথম অভিভাবক-হীন অবস্থায় ইউরোপ যাত্রা করলাম। নতুন জীবনের আশায় একটু ভীত, একটু উত্তেজিত আমার মন। প্রথম ক-দিন একা-একা বড় খারাপ লাগছিল। তবে বন্ধু জুটে গেল শিগগির, জাহাজে দিনও কাটলো ভালো। কয়েকজন জাহাজী বন্ধু আমাকে অসহায় অরক্ষিত দেখে আপনা থেকেই আমার অভিভাবক হয়ে বসলেন। জাহাজের অতি অল্পসংখ্যক অল্প-বয়সীদের কারও সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলেই তাঁরা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে অপরিচিতের বন্ধুত্ব কামনা করা বিপজ্জনক। দশটা বাজতেই আমাকে রোজ শুতে যেতে হতো। কয়েকদিন এই অভিভাবকত্ব মেনে চলার পর আর পারলাম না। ফলে আরও উপদেশে

আমাকে সিক্ত হতে হলো, আরও কোপ-দৃষ্টি এসে লাগলো গায়ে। তবু আমি অনাহতই বেঁচে রইলাম।
জওহর তখন জেনিভায়। কথা ছিল সে আমায় ব্রিন্দিসিতে এসে নামিয়ে নেবে। ট্রেন ফেল করায় আসতে পারেনি। আমি একা—এত ভয় পেয়ে গেলাম যে আমার কয়েকজন নতুন বন্ধু জাহাজ থেকে সেইখানে না নামলে আমার অবস্থা কী যে হতো বলা যায় না!
নেপল্‌সএ জওহর এল। আমরা সোজা জেনিভা না গিয়ে রোম, ফ্লোরেন্স এবং পথবর্তী অন্যান্য শহর দেখতে দেখতে চললাম, যা দেখি তাই ভালো লাগে। অনেক কিছুই পড়েছি রোম ফ্লোরেন্স সম্বন্ধে আগে। আরও কত শহরের কথা। রোমের অতীত গৌরবের কথা যখনই মনে পড়ে শিহরিত হয়ে উঠি।
এই সুযোগে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম জওহরের সঙ্গে—দেখলাম সঙ্গী আর চালক হিসেবে সে আদর্শ। আর মনেই হল না সে আমার জ্ঞানী, গুণী, মস্ত ভাই। এইভাবে দর্শনীয় সব কিছু দেখতে দেখতে, তার লোভনীয় সাহচর্যে দিনগুলি হয়ে উঠলো ভারি সুন্দর।
জেনিভাতে আমরা একটা ফ্ল্যাটে বাস করতাম। এত ছোট্ট জায়গায় থাকিনি এর আগে কোনোও দিন। প্রথমে ভারি ভালো লাগলো। তারপরেই আনন্দ-ভবনের বড়ো বড়ো ঘর আর প্রশস্ত অঙ্গনের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। সপ্তাহখানেক পরে জওহর আমাকে এনে দিল জেনিভার একখানা ম্যাপ, একখানা ইঙ্গ-ফরাসী অভিধান আর একখানা বাস ট্রামের কুপনের বই! বলল, 'এখানে তোমার চলবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আর চলতে যতো তাড়াতাড়ি শুরু করবে ততোই মঙ্গল।' কমলা অসুস্থ ব'লে গৃহস্থালির কাজও আমাকেই করতে হবে। করতে করতে অভ্যাসে

সে কাজ সহজ হয়ে এল পরে। তখন ফ্রেঞ্চ শিখেছি মোটে একটুখানি, সে না-শেখারই সামিল। ভাইয়ের এই চরম-ব্যবস্থায় একটু অবাক হয়ে গেলাম। তবু ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। করতে যখন হবেই তখন মেনে নিয়ে করাই ভালো। প্রথমেই একজন চমৎকার সুইস্ তরুণীর কাছে ফ্রেঞ্চ শেখা শুরু করলাম। পরে সে হয়ে উঠেছিলো আমার একান্ত অন্তরঙ্গ। আর পরিচারিকা মারগারিটের কাছ থেকে শিখে নিলাম ঘরকন্না। দেখলাম জীবনটা চালানো যত ভাবি তত শক্ত নয় আর চলেও বেশ। তবে মাঝে মাঝে একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয় বৈকি।

জেনিভায় একটা আন্তর্জাতিক গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয় ছিল। সারা পৃথিবীর লোকই জড়ো হতো সেখানে—বিশেষ করে অবকাশ-ভোগী ছাত্রেরা। ভারতীয়, চীনা, সিংহলী, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান আরও কত জাতি জমেছে এসে। জওহরের দেখাদেখি আমিও যোগ দিলাম স্কুলে। সেখানে জুটলো অনেক বন্ধু। তখন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন চলছিল। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ থেকে অধ্যাপকেরা এবং বিখ্যাত রাষ্ট্রনৈতিকেরা সব এসেছিলেন। বহু নাম-করা লেখকও ছিলেন। এঁরা সব ইস্কুলে বক্তৃতা দিতেন। বেশ লাগত। তা ছাড়া বহু রকম লোকের দেখা পাওয়া যেত—সারা পৃথিবীর বহু বিচিত্র লোক।

ইস্কুল থেকে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা হতো সপ্তাহের শেষে। কমলার শরীর ভালো থাকলে জওহর আর আমিও সেই ভ্রমণে যোগ দিতাম। একবার ঠিক হলো 'কল্ দে ভোজা' পাহাড়ে যাওয়া হবে। বেশ আনন্দেই যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে সুইস্ আর আমেরিকানই বেশি। ভারতবাসী শুধু তিনজন—জওহর, আমি আর একটি সিন্ধি ছাত্র। সে ছাত্রটি একটু বাবু গোছের।

নিখুঁত পোশাক নিয়েই সে ব্যস্ত। আমাদের সকলের পরনে ব্রিচেস, পুল-ওভার আর পায়ে কাঁটা-দেওয়া বুট; কিন্তু তাঁর পরনে টুইডের পায়জামা, পায়ে চক্‌চকে জুতো। (তিনি এখন ভারতবর্ষে কোথায় যেন মস্ত সিভিলিয়ান।) তার-চালিত রেলে খানিক পথ অতিক্রম ক'রে তারপর পদব্রজে অগ্রসর হলাম গন্তব্য অভিমুখে। ঘণ্টা দুই খাড়া চড়াই ভাঙার পর এলো বৃষ্টি, ঝড়, তুষার—একেবারে ভিজে গেলাম আমরা। জুতো পিছলে পিছলে আমাদের সিন্ধি বন্ধুটির অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠে-ছিলো। পাহাড়ে ওঠার সামর্থ তাঁর আর ছিল না। জওহর কখনও ব্যাণ্ডেজ, আইওডিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে না নিয়ে ভ্রমণে বেরত না। সে হঠাৎ একজোড়া দড়ির সোল-দেওয়া জুতো বন্ধুটিকে বার ক'রে দিতেই তিনি সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন।

আরও ঘণ্টাখানেক হেঁটে ভিজে চপচপে হয়ে একটা উষ্ণ, রৌদ্রোজ্জ্বল পাহাড়ে পৌঁছে দেখি বেশ নতুন তুষার পড়েছে তার ওপর! ক্লান্ত হলেও জওহর আর অনেকেরই লোভ সামলানো কঠিন হলো। দু বা তিনজনে এ-ওর পিছনে বসে উৎরাই-এর মুখে পিছলে চলে গেল তারা। আমি বড়ো ক্লান্ত, কি করি, বসে বসে শুধু দেখতে লাগলাম। জওহর আর একবার যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় একটি ছাত্র তার পেছনে বসতে গিয়ে অজান্তে ধাক্কা দিতেই সে গড়াতে শুরু করল! উৎরাই শেষ হয়ে যেখানে খাড়া খাদ নেমেছে সামলাতে না পেরে সোজা সেইদিকেই চলল জওহর পিছলিয়ে। নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সকলে। আমি তো আর নেই! এগিয়ে চলেছে বটে, তবু মাথা ঠিক রাখবার চেষ্টা করছে জওহর। হঠাৎ যেন এক অতি-মানুষের শক্তির বলে সে ঘুরে কতগুলি পাথরে

গিয়ে আটকে গেল। রক্ষা পেলো বটে, তবে মুখ, হাত সব ছড়ে গেল। সব কিছু ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। আর, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার হাঁটুর কাপুনি আর থামে না।

কাছেই বিশ্রাম কুটির, সেখানে গন্‌গন্ করছিল আগুন—নিঃশব্দে সবাই তার চারদিকে বসে গেলাম। সকলের সঙ্গে সিন্ধি বন্ধুটিও আগুনে জুতো শুকোতে লেগে গেল। সকলের শক্ত ভারি জুতো বেশ শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে-বেচারীর নরম হাল্‌কা জুতো শুকিয়ে কুঁকড়ে হয়ে গেল এতটুকু! ভারি মন-মরা হ'য়ে গেল সে।

কুটিরের মালিক বৃদ্ধ-দম্পতী আমাদের ভালো করে খেতে দিলেন। খাবার পর তাদেরই নতুন একটা বাড়িতে রাত কাটাতে হলো।

সকলের মতো খাট ছিল না, কাজেই মেয়ে দুজনের একটা খাটে, আর পুরুষদের মেঝেতে বিছানা হল। ভীষণ শীত, আমার সঙ্গে শুয়েছে মলি—সে বললে, 'এক কাজ করি এস, তুমি গায়ের চাদর-টাদরগুলো তুলে ধর আমি মোমবাতির আঁচে বিছানাটা গরম করে নিই।' উৎসাহভরে আমি তক্ষুণি রাজী হয়ে সেগুলো তুলে ধরলাম আর সে মোমবাতি এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে বিছানাটা গরম করতে লেগে গেল। এমন সময় কিসের একটা পোড়া গন্ধ পেলাম যেন, তাকিয়ে দেখি কি সর্বনাশ, চাদারে একটা ফুটো হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিইনি এই রক্ষা! পরের দিন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। বাড়ি ফিরে যেন বাঁচলাম।

জেনিভার অদূরে ভিলেনিউভে থাকতেন রোম্যাঁ রোল্যা। জওহরের

সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে যেতাম। আরও অনেক বিখ্যাত লেখক গায়ক এবং বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে আমার স্পষ্ট মনে আছে আইন্‌স্টাইনকে আর অর্ন্‌স্ট টলারকে। আইন্‌স্টাইন্‌কে দেখি আচার্য জগদীশ বোসের এক বক্তৃতা-সভায়; তাঁর সাহচর্য ঠিক লাভ করিনি। কেউ জানতেও পারেনি অন্যান্য লোকের পিছনে মঞ্চের উপর কোথায় তিনি অগোচরে বসেছিলেন। একটি আমেরিকান ছাত্র তাঁর উপস্থিতি প্রচার ক'রে দিতেই মহা কোলাহল উঠল সভাগৃহে। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর, নিতান্ত বিব্রত হয়ে তিনি এগিয়ে এসে সকলকে সলজ্জ অভিবাদন করলেন। মঞ্চে কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তারপরই কোথায় যেন মিশে গেলেন পিছনে।

ব্রাস্‌ল্‌সে দেখেছি টলারকে। দেখতে তেমন একটা কিছু নয় কিন্তু এমন অদ্ভুত চোখ যে মনে হত অন্তরের কথা পর্যন্ত বুঝতে পারছেন। কথা বলতে মোহ জাগত তাঁর সঙ্গে। কখনও তাঁর মুখে দেখতাম অপরিসীম বিষাদ, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

নাৎসিদের অত্যাচারে দেশ পরিত্যাগ ক'রে তাঁকে অন্যান্য দেশে আশ্রয় নিতে হয়। উঁচু দরের কবি ছিলেন তিনি। সত্য আর স্বাধীনতা, এই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এ-রকম নির্ভীক লোক আমি বড় একটা দেখিনি। কোনো জিনিসে একবার বিশ্বাস হলে আর বিবেকের সায় পেলে কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারত না।

জেনিভায় কয়েক মাস থাকার পর আমরা মন্তানার শৈলবাসে এলাম। ছোট্ট, একেবারে গ্রামের মতো, কিন্তু ভারি সুন্দর। বহুদিন এখানে রইলাম আর এইখানেই শীতকালীন খেলাধূলায় প্রথম যোগ দিই। শী আর স্কেট করতে ঐখানেই শিখি। শী'তে মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি চমৎকারই না সময় কেটেছে।

মন্তানায় থাকার সময় জওহর আর আমি প্রায়ই প্যারিস, বেলজিয়ম, জার্মানী বা কখনও ইংলণ্ডে যেতাম। ফ্রান্স, বিশেষ ক'রে প্যারিসকে, আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম; কিন্তু ইংলণ্ড আমার কখনও ভালো লাগেনি। আমরা সেখানে যেতাম কোনো সভা-সমিতি উপলক্ষে অথবা এমনি বেড়াবার জন্যে। প্রথম প্রথম জওহর একাই যেত। পরে সে বললে, 'আমার সেক্রেটারি হতে পারলে তোমাকেও নিয়ে যেতে পারি।' খুশিতে ভরে উঠল মনটা, আবার সেক্রেটারি হওয়ার কথায় ভয়ও হল। জানি তো জওহর বড় কড়া লোক—অযোগ্যতা সহ্য করতে পারে না। তবু যাওয়ার লোভ কি সামলানো যায়! ওর টাইপরাইটারটা চেয়ে নিয়ে খটাখট শুরু করে দিলাম—সেক্রেটারি হতে হবে তো। সেই থেকে তার সঙ্গে আমি প্রায় সব জায়গায় যাই। এ আমার এক শিক্ষা। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটা যত মজার হবে ভেবেছিলাম তত মজার হতো না। জওহরের ধারণা পরিশ্রমেই সবার নাকি সাফল্য—তাই আমাকেও সে রেহাই দিত না। সে বলে, কাজ আমি আগে কিছুই করিনি, শুধু আরাম ক'রে কাটিয়েছি এ-পর্যন্ত—এখন একটু কষ্ট করলে থাকব ভালো। সত্যি হয়েও ছিল তাই।

কাজ না থাকলে জওহর আমাকে মিউজিয়ম, চিত্রগৃহ, আরও কত কি দেখিয়ে নিয়ে আসত। কখনও সারাটা দিনই হেঁটে কাটিয়েছি। ক্লান্ত হলেই জওহরকে বলতাম, 'একটা ট্যাক্সি কর না।' জওহর বলত, 'রাজী আছি, যদি রাতে থিয়েটারে না যাও।' একজনের পক্ষে একসঙ্গে অত্যধিক বিলাস তার মতে অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাগ করে বলতাম, 'থাক দরকার নেই, আমি হেঁটেই বেশ যেতে পারব।' হাঁটার জন্যে থিয়েটার বাদ দিতে আমি রাজী নই। এ আমার পক্ষে হয়েছিল ভালো। দেশে থাকলে এ-সব কখনও

হতো না। মাঝে মাঝে ভাইএর উপর ভারি রাগ হতো—মনে হতো বিনা কারণে কষ্ট দিচ্ছে আমাকে।

যেখানেই যেতাম সেখানেই বন্ধুত্ব হতো অনেকের সঙ্গে—নানা রকম জাতের। তবে শিল্পী আর ছাত্র-বন্ধুই বেশি। একান্ত স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ হয়েছিলাম আমি ; ছেলে-মেয়ের বিভেদ করতে কখনও শিখিনি। আমি নিজেই ছিলাম চঞ্চল, স্বতোগতি। মা তাই মাঝে মাঝে বকতেন আমাকে। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মেলামেশা আমার চোখে মোটেই বিসদৃশ লাগত না ; আমিও লোকের সামনে একটুও অস্বস্তি বোধ করতাম না। কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এই যুদ্ধ বাধার এক বছর পর পর্যন্ত আমি করেছি। তারপর নাৎসিদের আক্রমণে তাদের দেশ বিধ্বস্ত হল। আমিও আর তাদের সন্ধান পেলাম না। আমি ভেবে পাই না তারা এখন বন্দী-শিবিরে আছে, না অসহায় হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশ্রয়ের আশায়। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিল আমার এই বন্ধুরা, ভবিষ্যতকে তারা পরোয়া করত না। তারা শান্তি আর প্রাচুর্যে ভ'রে তুলতে চেয়েছিল জগতকে। কিন্তু তা হবার নয়। রূঢ় আঘাতে তাদের স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কে জানে, সে স্বপ্ন আবার তারা গ'ড়ে তুলতে পারবে কি না।

সব চেয়ে সুখের সময় আমার কেটেছে সুইজারল্যাণ্ড আর প্যারিসে। কত বার মনে হয়েছে সেই নিরুদ্বেগ, উৎফুল্ল জীবনে আবার ফিরে যাই ; সেই সব পুরানো বন্ধুদের আবার ফিরে পাই। মতলবও করেছি, কিন্তু যাওয়া কখনও আর হয়ে ওঠেনি।

১৯২৬ সালের প্রারম্ভে ব্রাস্‌ল্‌সে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘের অধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে

জওহরকে যেতে বলা হল। আমি যথারীতি তার সঙ্গে গেলাম। পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রতিনিধি এসেছিল—সুদূর চীন থেকে, জাভা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফ্রিকা, আমেরিকা—আরও কত দেশ থেকে। দীপ্ত, আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন আফ্রিকা এবং আমেরিকার নিগ্রো-প্রতিনিধিরা।

এইখানেই সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। লোকে তাঁকে বলত 'চট্টো খুড়ো'। মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে, দেশ বিদেশে কপর্দক-হীন অবস্থায় তিনি ঘুরে বেড়ান, কোনোরকমে দিন চলে। কিন্তু অনেকের মতো জীবনে তাঁর বিরাগ আসেনি। বরং মুখে তাঁর সব সময়েই হাসি, আর সকলের জন্যেই মিষ্টিকথা। ধীর, বুদ্ধিমান তিনি, মনোহারী তাঁর ব্যবহার। অমন স্নিগ্ধ চরিত্রের লোক অল্পই দেখেছি। আমার তাঁকে খুব ভালো লেগেছিল. তাঁরও আমার প্রতি একটা স্নেহ জন্মে গিয়েছিল! আর, যতই দেখতাম তাঁকে, ততই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আমার বেড়ে যেত। সামনেই অনাহারের বিভীষিকা তবু দেখেছি তিনি অকুতোভয়। প্রায়ই তাঁর দুপুরের আহার জুটত দুটি আপেল—তাও তিনি কোনো দুস্থ ভারতীয় ছাত্রকে ভাগ না দিয়ে খেতেন না। ১৯২৬ সালের অকটোবর মাসে আবার যখন আমরা বার্লিন যাই, দেখি চট্টো সেখানে রয়েছেন। আমরা সবাই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম, তিনিও অকাতরে তাঁর স্নেহ ঢেলে দিতেন আমাদের। আমরা যাওয়ায় অনেকদিন পর কয়েকজন লোককে তিনি পেলেন, যারা তাঁকে নির্বাসিতের মতো দূরে সরিয়ে না রেখে আপনার জন বলে গ্রহণ করল।

বার্লিন ছেড়ে আসার দিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের স্টেশনে বিদায়

দিতে এসেছিলেন। একা একা ভবঘুরে জীবন যাপন করে কঠিন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিদায় দিতে এসে তিনি ভারি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ জলে ভ'রে এল, তিনি বললেন, 'কৃষ্ণা, বুঝতে পারছি না। এটা কি চিরবিদায় না আবার দেখা হবে; হয়তো দেখা হবে, কে জানে, হয়তো আমিই যাব তোমাকে দেখতে হিন্দুস্থানে।' অশ্রু ঘনিয়ে উঠল আমার কণ্ঠে; কেন জানি না, মনে হল, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ট্রেন ছেড়ে দিল, আমি হাত নাড়তে নাড়তে তিনি দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলেন। তাঁর মুখের শেষ-হাসি এখনও আমার মনে আছে। ঠোঁটের কাঁপুনি তিনি সে-হাসি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি একা, শূন্য-হৃদয়ে। আমরা চলে এলাম গৃহে, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তার মাঝে আর তিনি ফিরে গেলেন দুঃখ, কষ্ট ও নিঃসঙ্গতায়। তারপর কখনও কখনও 'চট্টো'র কাছ থেকে আমরা চিঠি পেয়েছি। কিছুদিন পর সব বন্ধ। কেউ বলল তিনি বেঁচে আছেন কিন্তু পড়েছেন নিতান্ত দুর্দশায়, আবার কেউ বলল রাশিয়ায় তাঁকে নাকি গুলি ক'রে মারা হয়েছে। আসলে কি যে ঘটেছে কেউ জানে না। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, সেটা এখনও রহস্যাবৃত।

অন্যান্য অনেক বিদ্রোহীদের সঙ্গে বার্লিনে এবং অন্যান্য শহরে দেখা হয়েছিল। তাঁদের মুখে গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগত তাঁদের সাহসের কথা ভেবে আমার মন গভীর শ্রদ্ধায় ভরে উঠত। তাঁদের স্বার্থত্যাগ, তাঁদের কষ্ট সওয়া তো ছিলই, তার ওপর ছিল তাঁদের নিত্য সহচর—অভাব। তবু হাসিমুখে তাঁরা দিন কাটাতেন। সারা পৃথিবীতে এঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন। কি

চমৎকার লোক এঁরা! কি অপরিসীম এঁদের সাহস! তবু দেশের কটা লোক জানে এঁদের কথা, আর জানলেও কে-বা এঁদের কথা ভাবে?

আর এক জনের কথা খুব মনে পড়ে আমার—তিনি ধনগোপাল মুখার্জি। এই উদীয়মান বাঙালী-লেখক তরুণ বয়েসে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে বহু বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ঘর বাঁধেন। বেশ লাগত তাঁকে, মনে জাগত নানা কৌতূহল। নিজে রোজগার ক'রে তিনি কলেজে পড়েছেন। কলেজ ছেড়ে বই লিখতে শুরু করেন। দুর্ভাগ্য এই, সে বইএর কথা ভারতবর্ষে কেউ জানে কিনা সন্দেহ। আমি যত বই পড়েছি তার মধ্যে তাঁর 'দি ফেস অফ সাইলেন্স,' 'কাস্ট অ্যাণ্ড আউটকাস্ট,' এবং 'মাই ব্রাদারস ফেস,' শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বই বলে মনে হয়। তিনি ছোটদের জন্যেও বেশ মজার মজার বই লিখেছেন, যেমন, 'গে নেক,' 'কারি দি এলিফ্যাণ্ট,' এবং আরও অনেক।

জেনিভায় জওহরের নামে এক চিঠি এল; লিখেছেন ধনগোপাল। জওহর তখন বিলেতে, তাই কমলা চিঠি খুলল। ধনগোপাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। কমলা লিখে দিল, 'জওহর এখানে নেই তবু যখন ইচ্ছে আপনি আসবেন। আমরা খুব খুশি হব।' দুদিন পরে বিকেল পাঁচটায় দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঝি-র সেদিন ছুটি। আমি দরজা খুলেই দেখলাম একজন যুবক দাঁড়িয়ে। আমি জিগগেস করলাম, 'আপনি কি চান।' তিনি বললেন, 'আমি মিসেস আর মিস নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' আমি সন্দিগ্ধ স্বরে জিগগেস করলাম, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, 'আমি ধনগোপাল মুখার্জি।' আমি তো একেবারে হতবম্ভ! কেন জানি না, আমি আর কমলা

তুজনেই ভেবে নিয়েছিলাম ধনগোপাল একজন দাড়িওয়ালা আলখাল্লা-পরা বৃদ্ধ। তার বদলে কিনা এই সুদর্শন যুবক— বন্ধুত্বে-ভরা তাঁর চোখ। কথা বলেন আমেরিকান টানে। বিস্ময় গোপন করে তাঁকে ভিতরে বসিয়ে কমলাকে খবর দিতে গেলাম। কয়েক মিনিট পরে ঘরে এসে দেখি ধনগোপাল হাঁটু গেড়ে নিভে-যাওয়া আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। আমরা ঢুকতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি একটু সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছি ; কিছু মনে করছেন না তো ?' ব'লে তিনি হাসলেন আর সেই হাসিতে জয় ক'রে নিলেন আমাকে আর কমলাকে, যেমন সে-হাসি জয় করত সবাইকে। তারপর ধনগোপালের সংস্পর্শে জীবন হয়ে উঠল একটানা এক বৈচিত্র্য। ফল, ফুল নিয়ে যখন-তখন এসে উপস্থিত হতেন, কখনও শাক-সব্জী নিয়ে এসে বাঙালী-ধরনে রান্না করতে মেতে যেতেন, যদিও সে-রান্না মোটেও বাঙালী ধরনের হতো না। আমাকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন আর বেড়াতে গিয়ে কি কাণ্ডই না করতেন! গরম লাগলেই কোট ওয়েষ্ট-কোট গা থেকে খুলে বগল-দাবা করে হাঁটতে শুরু করতেন। আমাকে বলতেন, 'দেখুন, আপনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে এত চঞ্চল হলেন কি ক'রে ? রোজ সকালে আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে ব'সে ধ্যান করবেন ; মনে তাহলে স্থৈর্য আসবে।' তাঁর খামখেয়াল ছিল অনেক। তবু তাঁকে খুব ভালো লাগত। বহুদিন আমাদের ভেতর চিঠিপত্র চলেছে। ১৯৩২ সালে ধনগোপাল কয়েকদিনের জন্য এদেশে এসেছিলেন। তখন তাঁর তরুণ মন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। জীবন পরিণত হয়েছে মরিচীকায়। লেখক হিসেবে তেমন সুবিধে হয়নি, সে-জন্য বেশ হতাশ। একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে

করেছেন। একটি ছেলে হয়েছে, নাম: গোপাল। এতদিনে তার বয়েস নিশ্চয় বছর পঁচিশেক হয়েছে। স্ত্রী বয়েসে তাঁর চেয়ে বড়—নিউ-ইয়র্কে মস্ত বড় এক মেয়েদের স্কুলের অধ্যক্ষ। স্ত্রীর আয়ে জীবন যাপন ধনগোপালকে বড় আকুল ক'রে তুলেছিল। ১৯৩২ সালের পর থেকে তাঁর চিঠিপত্র বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হতে লাগল। তারপর সব বন্ধ। ১৯৩৫ সালে শুনলাম তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

ধনগোপাল ছিলেন আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের তিনজনেরই মনে খুব আঘাত লেগেছিল। আমরা হারালাম একজন সত্যিকারের বন্ধু আর ভারতবর্ষ হারাল তার অখ্যাত অথচ এক অতি প্রতিভাবান সন্তানকে।

১৯২৭ সালের গ্রীষ্মে বাবা এলেন ইউরোপে। জওহর আর আমি খুব খুশি হলাম। বাবার যে শুধু বিশ্রামেরই প্রয়োজন ছিল তা নয়, সমস্ত পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়েছিল। আমাদের ভয় হচ্ছিল বুঝি বা শেষ মুহূর্তে তাঁর আসার পথে আবার কোনো বিঘ্ন ঘটে। সুখের বিষয়, বিঘ্ন আর ঘটেনি ; তিনি লিখলেন টিকিট কেনা হয়ে গিয়েছে। রওয়ানা হবার ঠিক আগের চিঠিটায় তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'ওদিকে তুমি আর জওহর আর এদিকে স্বরূপ আর রঞ্জিৎ আমাকে ইউরোপে বিশ্রাম নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতেই রওয়ানা হতে পারব। এই সাত বছর দেশের কাজ ক'রে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর সব কিছু সত্ত্বেও দেশ যে স্বাধীনতার পথে বিশেষ এগিয়ে যায়নি ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েছি। তাই ঠিক করেছি এবার কিছুদিন ছুটি নেব, তোমাদের সঙ্গে থাকার আনন্দ থেকে নিজেকে আর বঞ্চিত করব না।' ব্রাস্‌ল্‌স অধিবেশন

(সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘ) সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথার উত্তরে বাবা ঐ চিঠিতেই লিখেছিলেন, 'ব্রাসেল্‌স্‌ অধিবেশন এবং তার সম্বন্ধে তোমার কথা খুশি হয়ে পড়েছি। তুমি দেখছি একটি ছোট-খাটো রাষ্ট্রনৈতিক হয়ে উঠেছ; তবে ভেব না যেন মেয়ে ব'লে তোমার কোনো অসুবিধে হবে। পুরুষদের মতো অনেক মেয়েরাও দেশের উন্নতিতে মহৎ অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সবই নির্ভর করছে তোমার দেশাত্মবোধ ও আত্মনিয়োগের আন্তরিকতার উপর। নারীত্ব কোনো বাধাই নয়। বরং স্থির-প্রতিজ্ঞ মেয়েদের প্রভাব পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। তাই সুযোগ সম্ভাবনার তোমার কোনো অভাব নেই। তোমার রক্তে রয়েছে স্বদেশ-প্রেম। তুমি জোর ক'রে যদি না সে প্রবৃত্তিকে দমন কর তো সে একদিন জাগবেই।'

১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বরে বাবা এসে পৌঁছুলেন। তাঁকে পেয়ে আমরা যেমন খুশি হলাম, তিনিও এক বছর বিচ্ছেদের পর নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে এসে তেমনি খুশি হলেন। জওহরের সঙ্গে যেমন পড়াশুনা ক'রে, তার সেক্রেটারি-গিরি ক'রে, এটা-সেটা করে কাটিয়েছি—বাবার সঙ্গে তেমনি পরের মাস ক'টা অলস বিলাসিতায় কাটিয়ে দিলাম। বেশ লাগল। তবু খুব বেশি গা ঢেলে দিতে পারিনি, এই যা রক্ষে।

বহুদিন আগে জওহরকে হ্যারোতে ভর্তি করতে এসে লণ্ডনে বাবা যে হোটেলে থেকেছিলেন সেখানে এসে উঠলাম তাঁর সঙ্গে। পৌঁছে হল্‌-পোর্টারকে জিগগেস করলাম, 'কোনো চিঠি আছে আমাদের?' 'কি নাম, মিস্‌।' 'নেহেরু।' 'নেহেরু, নেহেরু,' বিড় বিড় করতে-করতে সে খোপগুলো খুঁজতে লাগল।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'বহুদিন আগে এক ভদ্রলোককে জানতাম, মিস্—নেহেরু তাঁর নাম। খুব বড়লোক আর ভারি সুন্দর লোক তিনি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ভারি সুন্দরী। তাঁদের ছোট্ট ছেলে হ্যারোতে পড়তে যেত। আপনি কি তাঁদের কেউ?' সানন্দে বিস্মিত পোর্টারকে বললাম, 'তখনকার সেই ভদ্রলোক আমারই বাবা আর ঐ যে একটু টাক-পড়া ভদ্রলোকটি —ও-ই সেই হ্যারোতে-পড়া ছেলে।' পোর্টার ভারি খুশি হল এ-কথা শুনে, তারপর থেকেই দেখি আমাদের প্রতি সে বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠেছে। এতদিন ধ'রে আমাদের নাম সে মনে ক'রে রেখেছে দেখে বিস্মিত ও অভিভূত হল আমার মন।

যেখানেই বাবার সঙ্গে যাই সেইখানেই পাই রাজকীয় অভ্যর্থনা। হোটেলে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ম্যানেজার অভিনন্দন জানিয়ে ফুল পাঠায়; তারপর নিজে এসে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ খবর করে। সারাক্ষণই লোকে ঘিরে রয়েছে আমাদের। এই ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন আমার অন্ততঃ লাগল বেশ।

আমাদের প্যারিসে রেখে বাবা একবার লণ্ডন একা গেলেন। আমাকে জিগগেস করলেন, 'কি আনব তোর জন্যে?' একটা খাটো চামড়ার কোট পরার আমার বহুদিনের শখ। জওহরের মতে চামড়ার কোটের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই কেনা আর হ'য়ে ওঠেনি। বাবা ব'লে গেলেন নিশ্চয়ই আনবেন কিন্তু ভুলে গেলেন আমার মাপ নিতে। লণ্ডনে পৌঁছে সেল্‌ফ্রিজের দোকানে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, 'আমার মেয়ের জন্যে একটা চামড়ার কোট চাই। কিন্তু তার মাপ আনিনি। ৫ ফুট ২ ইঞ্চির কাছাকাছি আপনার দোকানের কয়েকটি মেয়ে যদি আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক-একবার কোটটা

পরে তো আমি ঠিক ক'রে নিতে পারব কোনটা আমার মেয়ের গায়ে হবে।' ম্যানেজার এই অদ্ভুত অনুরোধে কিছু বিস্মিত হলেও খরিদ্দারের মনস্তুষ্টির জন্যে রাজী হল। এই অদ্ভুত উপায়ে বাবা নিয়ে এলেন আমার জন্যে এক চমৎকার কোট। কেনার ধরনে যে কিছু অন্যায় বা অসাধারণত্ব ছিল এ তাঁর মনেই হয়নি। গল্প শুনে আমি আর কমলা তো হেসেই খুন ; জওহর কিন্তু চ'টে গেল। সে বলল, 'এ বাবার ভারি অন্যায়। করলে কেউ কিছু বলতে পারবে না ব'লেই কি সে-কাজটা করা উচিত ?'

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে অল্প দিনের জন্যে আমরা সকলে বার্লিনে এলাম। রুশ-বিপ্লবের দশম বার্ষিক স্মরণোৎসবে বাবার আর জওহরের দুজনেরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল। জওহর বললে, 'যাব।' কমলা আর আমিও খুব উৎসুক যেতে। বাবা বললেন, 'ব্যর্থ পরিশ্রম হবে। এক সপ্তাহ পরে এসেই তো আমাদের মার্সেই-এ জাহাজ ধরতে হবে।' জওহর তবু যাবেই। বাবা আর কি করেন, মত দিলেন। সকলে এলাম মস্কো। দীর্ঘ, অস্বচ্ছন্দ ভ্রমণে বাবা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

তখন কঠোর নিরানন্দ পরিবেশ মস্কোর। পরনে সবার সাদাসিধে মোটা পোশাক। তবু তাদের দেখতে ভালো লাগে—মনে হয় আগুন রয়েছে ওদের ভেতরে। সমূহ কষ্ট সহ্য করবার, সমূহ স্বার্থত্যাগ করবার স্থির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাদের। জগতের মাঝে নিজেদের দেশকে শ্রেষ্ঠ আসনে তারা বসাবেই।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে উঠলাম। বিরাট বাড়ি—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। জার্-এর আমলের সমস্ত আসবাবপত্রের উপর মোটা কাপড় ঢাকা—ধনিকতন্ত্রের আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। খুব শীত তখন। সকালবেলা উঠে ঘণ্টা নেড়ে পরিচারিকাকে ডাকলাম।

সে এলে বললাম, 'গরম জল।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে আমার দিকে। নানাপ্রকার আকারে ইঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দিল যে আমি এমন কেউ নই যে স্নান করার জন্যে অতখানি গরম জল পেতে পারি। মুখ ধোবার জন্যে আধ জগ ক'রে জল আমাদের প্রাপ্য। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। কিন্তু বাবার তা হবার উপায় নেই। রাশিয়াই হোক আর যেখানেই হোক, শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই স্নান তাঁর করা চাই। এ অভ্যাসের পরিবর্তন অসম্ভব। হোটেলের লোকেরা মহা বিরক্ত। বাবাও কিছুতে স্নান না ক'রে ছাড়বেন না।

অন্য অনেকের মধ্যে পররাষ্ট্র সচিব চিচারিণের সঙ্গে বাবার দেখা করার কথা ছিল। চিচারিণ অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। অনেক ভাষা জানেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় জানাবার জন্যে একজন রুশ এসে বাবাকে বলল, 'অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় কাল ভোর চারটের আগে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।' বাবা ভাবলেন লোকটার বুঝি মাথা খারাপ, বললেন, 'ভোর চারটের সময়?' লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছেন। ভোর চারটের সময়েই।' বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিগগেস করলেন, 'রাত চারটে অবধি আমি করব কি?' এই সময়ে দেখা করার ইচ্ছা বাবার মোটেই ছিল না। তাই রাত একটার কাছাকাছি অন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করা হল।

উৎসবটা হয়েছিল ভারি জমকালো। শুনেছিলাম লালফৌজের কুচ-কাওয়াজ দেখবার মতো ব্যাপার। একদিন পরে পৌঁছবার জন্য সে দৃশ্যটা দেখা আর ঘটল না। রেড স্কোয়ারে লেনিনের সমাধিতে কাচের আধারে আরকে রক্ষিত লেনিনের দেহ। নির্দিষ্ট সময়ে লোক এসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। বহু লোক

শ্রেণীবদ্ধ, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেইখানে খালি মাথায়। সমাধির বাইরে দুজন সশস্ত্র সৈনিক, ভিতরেও কয়েকজন। আমরাও সমাধি দেখতে গেলাম। এখনও এমন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে লেনিনের মূর্তি, মনে হচ্ছে এখুনি উঠে এসে কথা বলবেন।

সমস্ত অতিথিদের সম্মানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভোজ দেয়া হল একদিন। দুজন কমিসারের মাঝখানে আমার বসবার জায়গা মিলেছে। তাঁদের লম্বা দাড়ি—চেহারায় ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। চমৎকার লোক তাঁরা, আর চমৎকার ফ্রেঞ্চ, ইংরিজি বলেন। ভোজটা চলল অনেকক্ষণ ধরে। তেষ্টা পেয়েছে। তাকিয়ে দেখি পানীয় কিছুই নেই। কমিসারদের জিগগেস করতে ইচ্ছে হল না। তাই চুপ ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম, যদি কোথাও কিছু মেলে। দেখলাম প্রত্যেক প্লেটের কাছে ছোট ছোট গেলাশ আর মাঝে মাঝে কাচের জলের বোতল। মনে হল তাতে জলই রয়েছে। আমি হাত বাড়াতেই একজন কমিসার নিজে এক গেলাশ ঢেলে নিলেন আর আমার ছোট্ট গেলাশও ভর্তি করে দিলেন। দেখলাম তিনি ঢক্ ক'রে গিলে ফেললেন। আমিও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু অর্ধেক না চুমুক দিতেই নিঃশ্বাস যেন আটকে গেল। গলা উঠল জ্বলে। চোখে এল জল। ধীরে ধীরে গেলাশটি নামিয়ে রেখে সামনের কিছু খাবার কয়েক গ্রাস খেয়ে নিলাম। অনেক, অনেকক্ষণ পরে একটু ভালো বোধ হল। পরে শুনলাম আমি যা খেয়েছি সেই হল রাশিয়ার বিখ্যাত ভদকা—জল নয়।

অনেক জিনিস দেখেছিলাম মস্কোতে। রাশিয়ার আর কোনো জায়গায় যাইনি। বেশির ভাগ গির্জাই মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। তবু এখনও দেখা যায় এক-আধজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গির্জার

পাশ দিয়ে যাবার সময় ক্রশের চিহ্ন আঁকছে হাত দিয়ে। চারদিকে বড় বড় বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে: 'ধর্ম হল মানুষের আফিম'—এই রকম আরও কত। এসব সত্বেও এখনও লোকের মন থেকে ভগবান একেবারে তিরোহিত হননি।

আমার মনে সব চেয়ে রেখাপাত করেছে রাশিয়ার একটি কারাগার। ১৯২০ সালের পর থেকে অনেক কারাগারই তো দেখেছি। রাশিয়ায় বন্দীদের অবস্থা কিরকম দেখবার খুবই ইচ্ছে ছিল, রাজনৈতিক এবং সাধারণ—দুরকম বন্দী-ই। ভারতবর্ষে দেখেছি জেলের ফটকের বাইরে সশস্ত্র সৈনিক। ভেতরেও ওয়ার্ডারেরা হয় বেটন, নয় অন্য কোনো অস্ত্র হাতে নিয়ে ঘোরে। সোভিয়েট-বন্দীশালায় দেখলাম একজন মাত্র সৈনিক বন্দুক হাতে বাইরের গেটের সামনে পায়চারি করছে। ভেতরে প্রহরীদের হাতে কোনো অস্ত্রই নেই—না বেটন, না বন্দুক। আমরা একেবারে ভেতরে ঢুকে গেলাম। জেলের তত্ত্বাবধায়ক বললেন, 'আপনারা যে কোনোও ঘরে যেতে পারেন।' জানিনা এই-ই সাধারণ ব্যবস্থা না আগন্তুকদের প্রীতিদানের জন্যে এটি বিশেষ ব্যবস্থা। কয়েকটি সেল ঘুরিয়ে আমাদের দেখান হল। প্রত্যেক কয়েদীরই ভিন্ন ভিন্ন ঘর। ঘরের দরজা একেবারে খোলা। কয়েদীরা যখন ইচ্ছে বাইরে যাচ্ছে, যখন ইচ্ছে ভেতরে আসছে। যাতায়াতের পথে প্রহরীরা নজর রাখছে। আর কোনোরকমেই তারা কারও কাজে হস্তক্ষেপ করছে না। কয়েকজন কয়েদী নিজেদের তৈরি রেডিও শুনছে। কেউ কেউ নিজেদের যন্ত্র নিয়ে সঙ্গীত আলাপ করছে। কয়েদীদের নিজেদের একটা অর্কেস্ট্রা আছে। সপ্তাহে একবার সমবেত যন্ত্র-সঙ্গীত হয়। কেউ ঘরে ব'সে সঙ্গীত রচনা করছে, আবার কেউবা বেড়াচ্ছে বাইরে, কেউ হয়তো ওয়ার্কশপে

গিয়েছে কাজ করতে। ভারতবর্ষে কয়েদীদের মুখের উপর দেখেছি ভয়ের, উদ্বেগের ছায়া ; পশুর মতো ব্যবহার পায় তারা। এখানে দেখলাম কয়েদীরা মানুষের মতো। এই কারাগারটিকে অবিশ্যি প্রায় আদর্শ-কারাগার বলা চলে। অন্য জায়গায় যা পড়েছি বা শুনেছি তা থেকে মনে হয় না সব জেলগুলিই এই রকম।

মনে পড়ে মস্কোতে আর একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। বিশেষ কোনোরকম সাজগোজ না ক'রে, একখানা সাধারণ ঢাকাই শাড়ি প'রে এক মিটিং-এ একদিন গেছি। সেখানে তখন বেশের পারিপাট্য লোকে মোটে সইতে পারত না। একজন কমিউনিস্ট তরুণী আমার পাশেই ব'সে ছিল। সে ঝুঁকে প'ড়ে আমার কপালের কুমকুম্-চিহ্ন প্রায় স্পর্শ করে বলল, 'এটা পরেছ কেন? কোনো ধর্মের আচার নয় আশা করি। রাশিয়ায় আমরা ধর্ম-টর্মকে পাত্তা দি না।' আমি একটু ভড়কে গেলাম। নিজেও এ-কথা ভেবে দেখিনি কোনোদিন। প্রশ্নের জবাবে তাকে সত্যি কথাই বললাম। তার মন যেন সেটা বিশ্বাস করল না। সে বলল, 'যদি ধর্মের আচার না হয়, তাহলে ওটা সুন্দর দেখাবার চেষ্টা। তুমি কি সেইজন্যে এটা ব্যবহার কর? কমিউনিস্টরা এই সব ধনিক-মনোবৃত্তি-সুলভ কৃত্রিম সৌন্দর্য-চর্চার পক্ষপাতী নয়।' উত্তরে আমি বললাম, 'এখনও আমি কমিউনিস্ট হইনি তবে হবার আশা রাখি। যাই হোক, রাশিয়ান-দের আমি খুব শ্রদ্ধা করি।' তাতে মেয়েটি একটু শান্ত হলেও আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগল যেন আমার বিশেষ কিছু আশা নেই। তখনকার দিনে ভালো পোশাক রাশিয়ায় ভারি লজ্জার কারণ ছিল। আমাদের সবচেয়ে শাদাসিধে শাড়িটাও খাপছাড়া দেখাত সেখানে। চিন্তা করতে লাগলাম—

জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকার মানেই কি সৌন্দর্যবোধকে মেরে ফেলা? আবার ভাবি যে মেয়েটিই হয়তো অতিরিক্ত কঠোর।

এক সপ্তাহ পরে বার্লিনে ফিরে এলাম। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ক্ষণিক হলেও গভীর রেখা পড়ল মনে। অনেক কিছুই তখনও রাশিয়ায় কার্যে পরিণত হয়নি, তবু কী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে তারা চলেছে—সেটাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। এ উৎসাহ নিশ্চয়ই পর্বত-প্রমাণ বাধাবিঘ্নও অতিক্রম করতে পারবে সহজে। আমি মনে প্রাণে কামনা করেছিলাম এরা উন্নততর সমাজ গড়ুক, যার ফলে সারা বিশ্বের হবে মঙ্গলবৃদ্ধি।

বাবার পক্ষে এই সমষ্টিপ্রাণ রাশিয়াকে বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠছিল। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং মনোবৃত্তি ছিল অন্যরকম। এই নতুন বিদ্রোহী ভাবধারা তিনি না বুঝলেও রাশিয়ায় গিয়ে তিনি আনন্দিতই হয়েছিলেন। যেটুকু তিনি দেখেছিলেন সেটুকু সত্যিই দেখবার মতো। নতুন ধারায় গড়ে উঠছে এই দেশ—দেখে গভীর রেখাপাত করেছিল মনে। অল্পকালের হলেও এ-দেখা চিরস্মরণীয়।

৪

'শুধু কি মধুরতর অতীতের লাগি',
অশ্রুজল ফেলে যাবে দিন ?
শুধু লজ্জা হবে সার ?
পিতৃপিতামহগণ দিয়ে গেছে বক্ষের শোণিত,
হে ধরণী, তব বক্ষপঞ্জরের তলে
স্পার্টা-র যত বীর নিদ্রাগত
তার কিছু দাও ফিরাইয়া—
তিন শত হ'তে দাও শুধু গুটি তিন ;
নব থার্মপিলি গড়ে তুলি।

—বায়রন

মস্কো থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে প্যারিস। কয়েক সপ্তাহ পরে, মার্সেই থেকে বাড়ির দিকে যাত্রা।

আগে একসঙ্গে এতদিন কখনও মায়ের কাছ-ছাড়া হয়ে থাকিনি। বাড়ি গিয়ে তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব। তবু প্যারিস ছেড়ে যাবার দিন মন বেশ একটু খারাপ লাগছিল। বহু আনন্দের দিন কাটিয়েছি এখানে ; ভালোবেসেছি এই মুখর সুন্দর শহরকে। ছেড়ে যাবার সময়ের একটু আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি কী গভীর আকর্ষণ এই প্যারিসের। ট্রেনে যেতে যেতে ভাবছিলাম আবার কবে দেখব ফ্রান্সের এই মনোরম রাজধানী। কেমন যেন মনে হল আর কখনও দেখব না একে ; আর যদি বা দেখি তখন এর রূপ যাবে বদলে। তখন মনেও হয়নি আমার প্রিয় প্যারিস কয়েক

বছর পরেই নাৎসিদের হাতে প'ড়ে হারিয়ে ফেলবে তার বিশ্বের খ্যাতি-দীপ্ত হাসি, গান, শিল্প।

বাবা আরও কয়েক মাস ইউরোপে থাকবেন ঠিক করলেন। জওহর, কমলা, তাদের মেয়ে ইন্দিরা আর আমি ১৯২৭ সালে কলোম্বো হয়ে দেশে ফিরলাম। সেই বছর শীতকালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হচ্ছিল। তাই মাদ্রাজে দশ দিন থেকে ফিরে এলাম এলাহাবাদ।

বাড়ির পরিচিত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি এল মনে। ফিরে আসার পর কয়েক মাস কিছুতেই আর সুখ পাই না। ইউরোপের মুখর জীবন এখানে শ্লথ হয়ে এল। কি করি ? শুধু অজস্র পড়াশুনো করা ছাড়া উপায় নেই। কিছুতেই আর ফিরে যেতে পারি না সেই পুরনো জীবনে ; সে-জীবনধারায় নিজেকে মেশানো অসম্ভব—শুধু ভেসে ভেসে বেড়াই। এই সময় এলাহাবাদে একটা মন্তেসরি স্কুল খোলার কথা শুনলাম। ছোট ছেলেমেয়েদের আমার চিরকালই খুব ভালো লাগে আর মন্তেসরি পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার বেশ খানিকটা জ্ঞানও ছিল। ঠিক করলাম ঐখানেই একটা চাকরি নিতে হবে। চাকরি সহজেই হয়ে গেল। মনেই হয়নি এ-বিষয়ে আবার বাবার মতামত নিতে হবে। এই সময়ে স্বরূপ আর তার স্বামী, তাদের দুটি মেয়ে চন্দ্রলেখা আর নয়নতারাকে মায়ের কাছে রেখে, বিলেত চলে গেল। মায়ের তখন খুব শরীর খারাপ। তাদের আমি খুব ভালোবাসতাম সত্যি ; তবু দেখাশোনা করাটা বড় সহজ নয়।

বাবা ইউরোপ থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। একদিন দেখি মেজাজ খুব ভালো। বুদ্ধি ক'রে কথাটা পাড়লাম। বললাম,

একটা মনের মতো কাজে দিনের পাঁচ-ছ'ঘণ্টা না কাটাতে পারলে মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। বাবা বললেন,'বেশ তো, কিছু ঠিক করেছ? আমার বা জওহরের সেক্রেটারির পদ নিতে তোমার আপত্তি কি?' খুব ভালো প্রস্তাব, কিন্তু জানি, চলবে না। ও কাজে তো কোনো শৃঙ্খলা, কোনো বাঁধা-ধরা সময়ের তাগিদ নেই। বাবাকে বললাম, 'আমি ঠিক ও-কাজের কথা ভাবিনি। ঐ যে স্কুলটা খুলছে, ঐ স্কুলে শিক্ষয়িত্রী হতে চাই।' কথাটা প্রথমে তাঁর বিশ্বাসই হল না। তারপরে যখন দেখলেন আমি সত্যিসত্যিই বলেছি তখন সোজা ব'লে দিলেন, 'ও সব হবে না। একদল ছোট ছেলে নিয়ে অতক্ষণ কাটাতে তোমার কখনও ভালো লাগবে না। তবে সময় কাটাতে চাও তো ঘণ্টা দুয়েক রোজ গিয়ে দেখতে পার।' মনে হল বাবা এখনও ঠিক বিশ্বাস করেননি আমার কথা।

বাবার কাছে নিজের কথা বলতে হলে সত্যিই সাহসের দরকার হতো। বহু সাহস সংগ্রহ ক'রে বিনীত হয়ে তাঁকে জানালাম, 'চাকরিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। তারা আমায় নিতে চেয়েছে। শুধু আপনার অনুমতি চাই। আর আমি মাইনে নিয়েই চাকরি করব।' যা মনে করেছিলাম ঠিক তাই। কথা শেষ হবার আগেই এল ঝড়। তিনি বললেন, 'কাজ করবে। কিন্তু মাইনে কেন?' আলোচনায় কোনো ফল হল না। বাবা আর আমি কেউই এক চুল নড়ি না। ভেসে গেল আমার খেটে খাওয়ার স্বপ্ন। বাবাকে এত ভালোবাসতাম যে তাঁর অবাধ্য হতে পারলাম না। কিন্তু এই প্রথম তাঁর কর্তৃত্বে মনে রাগ হল। রাগারাগি না ক'রে চিন্তা করতে লাগলাম কি ক'রে বাবার মত বদলানো যায়। মায়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি ভেবে চিন্তে বললেন, 'না, ওতে

আমি মত দিতে পারি না। বিয়ে-থা ক'রে ঘর সংসার কর।'
চাকরি করলে নাকি বিয়ের আশা আরও সুদূর পরাহত হয়ে যাবে। জওহরকে ধরলাম। ভারি আনন্দ হল সে যখন বলল, 'হ্যাঁ, কাজ তো করবেই এবং মাইনে নিয়েই। বাবার মত আমি করিয়ে দিচ্ছি।'

জওহর ভারি খুশি হয়েছিল আমার এই প্রস্তাবে। গভীর স্বস্তিতে আমি তার হাতেই সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। জানতাম ওর হাতে সব ঠিক হয়ে যাবে। বহু তর্ক-বিতর্কের পর বাবা মত দিতেই আমি শুরু ক'রে দিলাম মাস্টারী। প্রায় বছর দেড়েক ধরে মনের সুখে কাজ ক'রে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্যে কাজ ছেড়ে দিলাম। দু'নৌকোয় পা দিয়ে তো চলা যায় না, অবসর সময়ের জিনিস রাষ্ট্রনীতি নয়। ওতে সমস্ত সময়টুকু দিতে হয়। আইন-অমান্য-আন্দোলন তখন চলেছে। আমি আমার সমস্ত সময় ওতেই নিয়োজিত করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

সারা বছর ধরে সারা ভারতবর্ষেই কর্মোন্মাদনা চলেছে। লোকের দিনে দিনে রাষ্ট্র-চেতনা জেগে উঠছে। তারা নতুন আশা, নতুন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। চারদিকেই ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে জাগরণের সাড়া। একটা বড় কিছু যেন শীঘ্রই ঘটবে। জগতে কোনো শক্তিই তাকে ঠেকাতে পারবে না। যুক্ত-প্রদেশের চাষীদের মধ্যে সেদিন বিশেষ চাঞ্চল্য দেখেছিলাম। যুব-আন্দোলনও বিস্তৃত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে সারা ভারতে যুব-সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠল। তারা সভা ক'রে সংকল্প নিল ভারতকে স্বাধীন করবে। সঙ্ঘের ছেলে-মেয়েদের কিছুদিনের জন্যে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে। আর একজন বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে আমি এলাহাবাদ-যুব-সঙ্ঘের

সম্পাদকের কাজ করি; জওহর আমাদের সভাপতি। তরুণ, সাহসী আমার সহকর্মী—উৎসাহ, উত্তেজনায় ভরা। কিন্তু বছর দুই পরেই কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য বিসর্জন দিয়ে তিনি তাঁর মত এবং কর্মধারার পরিবর্তন করেন। এর পর আর তাঁর খোঁজ রাখিনি। আমার সে-সময়ের সহকর্মীর মধ্যে অনেকে বিভিন্ন দলে যোগ দিয়েছেন; কেউ কেউ কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছেন। এখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে মনেই হয় না এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, এক সঙ্গে কষ্ট পেয়েছি, পুলিশের লাঠি খেয়েছি—একেবারেই যেন অপরিচিত তাঁরা।

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা-অধিবেশনে বাবা সভাপতিত্ব করেন। ট্রেনে কতকগুলি বিশেষ কম্পার্টমেণ্ট জুড়ে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে এক দল আমরা চলেছি এলাহাবাদ থেকে। কংগ্রেসের অতিথি হিসেবে আমাদের নিয়ে আসা হল এক বিরাট বাড়িতে—ফুল, লতা-পাতা, নিশান এবং জাতীয় পাতাকা দিয়ে সাজানো, সভাপতির সম্মাননার জন্যে। তোরণের সামনে পোশাক-পরা অল্পবয়সী ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে ঘোড়ায় চ'ড়ে। তারা কাজেরও যেমন, ভদ্রও তেমনি। যখনই বাবা গাড়িতে বেরুতেন তখনই তাঁর আগে পাছে জন-সমৃদ্ধি: প্রথমেই ঘোড়ায় সোজা হয়ে ব'সে অত্যন্ত আত্মসচেতন ভাবে যেত একদল অল্পবয়সী ছেলে। তারপর স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক, পাইলট-কার্-এ জমকালো পোশাকে সুভাষ বোস। তারপর, বাবার গাড়ি। দেখতে খুব সমারোহ। কিন্তু এসব বাবা বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁদের ডেকে তিনি বললেন, 'দেখুন, আমার সঙ্গে সব সময় অতো রক্ষীদলের যাওয়ার কি প্রয়োজন? আমার জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই।'

এই অধিবেশনের সময়েই বাবার আর জওহরের মত-বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। এর আগে তাঁদের তর্ক হয়েছে, মত-দ্বৈধও হয়েছে, কিন্তু এত দূর গড়ায়নি। সর্বদল-বৈঠকে স্বায়ত্ত-শাসন-নীতি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্যে বাবা ব্যগ্র। কারণ সকলে পূর্ণ-স্বাধীনতায় মত দিতে রাজী নন। জওহর এই আপসে কিছুতেই মত দেবে না। পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব চলেছেই। ঘরে বাইরে আবহাওয়া ঘন হয়ে উঠল। উন্মুক্ত অধিবেশনে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রস্তাব গৃহীত হল। জওহর দাঁড়াল তার বিরুদ্ধে।

পরের বছর কংগ্রেসের লাহোর-অধিবেশনে জওহর সভাপতি। কংগ্রেসের ইতিহাসে তো নয়ই, সারা পৃথিবীর রাষ্ট্র-নৈতিক ইতিহাসে বোধহয় কখনও রাষ্ট্রপতিত্ব বাপের হাত থেকে ছেলের হাতে সমর্পিত হয়নি। বাবার পক্ষে এ-অধিবেশন মহা আনন্দের। গর্বভরে, আনন্দে বাবা জওহরের হাতে ভার তুলে দিলেন। জওহর তাঁর শুধু পার্থিব সম্পদেরই উত্তরাধিকারী নয়, রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের চরম মর্যাদার আসন রাষ্ট্রপতিত্বেরও উত্তরাধিকারী।

এইবারকার কংগ্রেস অধিবেশন বহু দিক থেকে স্মরণীয়। ডিসেম্বরের এক তীব্র শীতের সকালে ইরাবতী নদীর তীরে হাজার হাজার লোক পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করল। সেই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের শুরু হল। হাড়-কাঁপানো শীত অগ্রাহ্য ক'রে নারী পুরুষ, ছেলেমেয়ের দল উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে গভীর শ্রদ্ধায় স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করল। জওহর পড়ল শপথ-বাক্য আর সকলে তার পুনরাবৃত্তি করল।

এমনি ক'রে দেশ করল স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিজ্ঞা। সেই ১৯২৯

সালের পরে কেউ কেউ স্বদেশকে পরিত্যাগ করলেও হাজার হাজার লোক তাদের কথা রেখেছে এবং অনেক কষ্ট সহ্য ক'রে আসছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে। স্বাধীনতা ভারতকে পেতেই হবে, না পেলে যে আর শান্তি নেই।

অধিবেশন শেষ হতেই এলাহাবাদ চলে এলাম আমরা। সামনে অনুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অনেক দুঃখ, কষ্ট, দ্বন্দ্ব যে সইতে হবে সে তো জানা কথা। তবু, কেন জানি না, হতাশা এল না মনে। বরং অনাগতকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার আনন্দে সাহস বেড়ে গেল। পেছিয়ে পড়ল না কেউ।

কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক মাস আগে বাবা আমাদের বাড়িটি দেশের কাজে দান ক'রে দিলেন। বহু দিনের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত ক'রে বাবা যেন পরম আরাম পেলেন। জওহরদের জন্যে যে বাড়ি তৈরি করেছিলেন সেই বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলাম। সুন্দর বাড়ি। বাবার পরম গর্বের বস্তু। ইউরোপে থাকার সময় এই নতুন বাড়ির জন্যে ইলেক্‌ট্রিক এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কিনেছিলাম। এই সব কেনা-কাটার ব্যাপারে তাঁর ছিল গভীর আনন্দ, এতে তাঁর ক্লান্তি আসত না কখনও।

নতুন বাড়ির নামকরণ হল 'আনন্দ-ভবন' ; কারণ 'আনন্দ-ভবন' ছাড়া আর কোথাও বাস করার কথা বাবা ভাবতেই পারতেন না। পুরনো বাড়ির নতুন নাম হল 'স্বরাজ-ভবন'। পুলিশ সেটা প্রায়ই তালা-চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দেয়। যখন খোলা থাকে, তার এক অংশে বসে কংগ্রেসের সেবাসদন আর এক অংশে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তর।

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজী তাঁর কয়েক জন বাছা-বাছা

কর্মী নিয়ে ডাণ্ডি যাত্রা করলেন লবণ-আইন অমান্য করবার জন্যে। স্মরণীয় ঘটনা। উদ্বেল জন-সমুদ্র তাঁর পিছনে। সারা ভারত উদ্গ্রীব হয়ে দেখচে কেমন ক'রে এই ছোট্ট মানুষটি নতুন অহিংসা-যুদ্ধে তাদের এতদিনের না-পাওয়া স্বাধীনতা এনে দেন। সরকারের ঘৃণ্য একচেটে লবণ-ব্যবসায়ের প্রতিবাদে প্রত্যেক শহর, প্রত্যেক গ্রাম যোগ দিল। এলাহাবাদে এক বিরাট শোভাযাত্রার পরে এক বিরাট সভায় জওহর প্রথম বে-আইনী নুন তৈরি করল।

মনে হয়েছিল গান্ধীজীকে ডাণ্ডিতে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু হল না। পাশের এক গ্রামে গভীর রাত্রিতে তাঁকে ধরা হল। অদ্ভুত! এতবড় সরকার—এই কটা লোককে অনায়াসে শায়েস্তা ক'রে দিতে পারে। তবু তাদেরই ভয়ে গভীর রাত্রিতে চোরের মতো এ কি ব্যবহার!

তারপরেই ধরা পড়ল জওহর। সহসা সমস্ত শহর, গ্রাম যেন জেগে উঠল। অহিংস দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জনতার উপর চলল অবিরাম গুলি, লাঠি। এল সন্ত্রাসের যুগ। নিজেদের সম্মান, মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দৃঢ় ধৈর্যে তারা এই পশুর মতো আক্রমণ সহ্য করল। মন্তেসরি স্কুলের কাজে তখন আমি জবাব দিয়েছি। স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করি, ড্রিল করি, শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করি কংগ্রেসের নির্দেশে। আমি আর কমলা সারাদিন রোদে ঘুরি—এ বাবা পছন্দ করতেন না। তিনি কখনও বকতেন না আমাদের, অথবা কাজ ছেড়ে দিতেও বলতেন না। তাঁর শরীর খারাপ; তাই চাইতেন তাঁর ছেলেমেয়েরা কাছে কাছে থাকুক। জওহর জেলে; আবার আমরাও যদি জেলে যাই এই ভয়। এই অস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি সারা দিনরাত্রি আন্দোলন

পরিচালনায় ব্যস্ত ; একটুও বিশ্রাম নেই। সইবে কেন অত পরিশ্রম। ডাক্তারেরা বলল বিশ্রাম নিতে। কিন্তু সরকার ডাক্তারদের বঞ্চিত ক'রে ১৯৩০ সালের ৩০শে জুন তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তাই শৈলাবাসের বদলে তিনি গঙ্গা পার হয়ে গেলেন নৈনী জেলে।

জেলে দশ সপ্তাহ যেতে না যেতে তাঁর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে গেল। যখন তাঁর শরীর প্রায় পূর্বের মতিলাল নেহেরুর ছায়ার সামিল হয়ে উঠেছে তখন গভর্নমেণ্টের মনে হল, এঁকে আর রাখা উচিত নয়। আমরা সবাই তাঁকে নিয়ে গেলাম মুসৌরী। পাহাড়ের আবহাওয়া, বাড়ির আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ক্লান্ত শরীরে কিছু বল এনে দিল। ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়ে জওহর আছে এলাহাবাদে। সে মাঝে মাঝে আসত—বাবা প্রভূত সান্ত্বনা পেতেন।

জওহরকে বেশি দিন মুক্ত অবস্থায় দেখা অসম্ভব। তার আশু-বন্ধনের সংবাদ কানে এল। বাবা ডাক্তারদের উপদেশের বিরুদ্ধে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এলাহাবাদ ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। ১৮ই অক্টোবর মুসৌরী ছেড়ে চললাম। স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছিল জওহর আর কমলা। কিন্তু ট্রেন ছিল 'লেট,' জওহর আর অপেক্ষা করতে পারেনি। এক সভায় তার যোগ দেবার কথা। আশে পাশের গ্রাম থেকে হাজারে হাজারে চাষীরা এসেছে। মিটিং-এর শেষে কমলা আর জওহরের বাড়ি ফেরবার পথে আমাদেরই বাড়ির সামনে তাদের গাড়ি থামিয়ে জওহরকে আবার নিয়ে যাওয়া হল নৈনী জেলে। বাড়িতে বাবা তার জন্যে প্রতীক্ষায়। সেই অসুস্থ পিতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি পর্যন্ত তার মিলল না।

জওহরের গ্রেপ্তার আশাতীত না হলেও রূঢ় আঘাত দিল বাবাকে। আশা করেছিলেন কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক এবং পারিবারিক কথা জওহরের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কিন্তু তা হবার নয়। দুঃখে কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলেন বাবা। কিন্তু তাঁর সিংহ-হৃদয়ে দুর্বলতা দীর্ঘকাল প্রশ্রয় পেল না। সেই শুভ্র মাথা উঁচু হল। তিনি বললেন, 'ডাক্তারদের হাতে অক্ষম হয়ে আর ব'সে থাকতে পারব না। কাজ আমি এখনি শুরু করব।' আশ্চর্য লাগে কেমন ক'রে বাবা শুধু মনের জোরে ঐ ভয়াবহ রোগ দমন ক'রে ফেললেন। তবু ক্ষণিক সে দমন। একটুও না দমে গিয়ে বাবা নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করলেন আইন-অমান্য-আন্দোলনকে। তাঁর শরীর কিন্তু ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগল। জওহর তাঁকে সমুদ্রযাত্রা করতে রাজী করাল কোনোরকমে। আমি যাব সঙ্গে। কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত এসেই তিনি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করলেন, যাত্রা স্থগিত রইল। এক শহরতলীতে কয়েক সপ্তাহ রইলাম আমরা। নিতান্ত দুঃখের সেই কয়েক সপ্তাহ। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি আর সেরে উঠবেন না। কিছু করবারও নেই কারও। এখানে বা ওখানে যেখানেই থাকুন তাঁর জীবনের মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস—এ-কথা জেনেও তিনি তাঁর অসুস্থতা নিয়ে হাসি-তামাশা করতেন। কোনোদিন তাঁকে বিষণ্ণ দেখিনি। শেষ পর্যন্ত ছিল তাঁর এই দৃপ্ত সাহস।

একদিন খবর এল কমলা গ্রেপ্তার হয়েছে। মোটেই সুস্থ ছিল না কমলা। বাবা ব্যথিত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন, 'আমি এখনই এলাহাবাদ যাব।' চিকিৎসকেরা তাঁকে জোর ক'রে আটকে রাখলেন। আমাকে তখনই এলাহাবাদ পাঠিয়ে দিয়ে দিনকতক পরে সকলের সঙ্গে নিজে ফিরে এলেন।

একটা মজার ঘটনা ঘটল এর পরেই। আমার বহু বন্ধু সহকর্মীরা রোজ ধরা পড়ছিল আর রোজ তাদের বিচার হচ্ছিল জেলে। বিচারে আমাদের উপস্থিত থাকতে হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতির প্রয়োজন। ভদ্রলোক এত দাম্ভিক এবং বিরক্তিকর যে কি বলব! একদিন বিকেলে যুব-সঙ্ঘের এক দলের বিচার হবে ; আমি অনুমতি নিতে গেলাম। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক চ'টে লাল হয়ে ব'লে উঠলেন, 'আবার আপনি এখানে ? আপনারা নিজের কাজে মাথা ঘামিয়ে আমার কাজ আমাকে করতে দেন না কেন ?' আমি নিরুদ্বেগে উত্তর দিলাম, 'যুব-সঙ্ঘের সম্পাদিকা হিসাবে যুব-সঙ্ঘের সভ্যদের বিচারে উপস্থিত থাকা আমার কাজ।' প্রথমে প্রত্যাখ্যান। আমি বললাম, 'সারাদিন এইখানে অপেক্ষা করতে হয় তাও ভালো, আমি অনুমতি না নিয়ে যাব না।' নিতান্ত বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক লিখে দিলেন অনুমতি-পত্র। আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'দোহাই আপনাদের আর এখানে আসবেন না। আপনারা আমাকে পাগল ক'রে দেবেন দেখছি।'

বিচারে গেলাম। ভাবতেই পারিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে এমনি ক'রে জুয়োচুরি করবে। সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার এক সম্পর্কীয় ভাইঝির সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি এমন সময় এল গ্রেপ্তারের পরোয়ানা। একসপ্তাহ আগে এক বে-আইনী সভায় উপস্থিত থাকার অপরাধে এই আদেশ। অবাক হয়ে গেলাম। কিছু করবার নেই। আমার ভাইঝি শ্যামকুমারী কোনোদিনই রাষ্ট্রনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। সে আইন-ব্যবসায়ী ; শুধু কৌতূহল বশে ব্যবসায়ের দিক থেকে এই বিচার দেখতে যাচ্ছিল। 'নেহেরু' হওয়াই তখন যথেষ্ট

অপরাধ। আমাদের শাস্তি হল ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাস জেল।

এতে মাত্র একটি কারণে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। বাবা অসুস্থ; বারবার আমাকে বলেছেন : 'তুমি অন্ততঃ জেলে যেও না এ সময়।' কি ক'রে তাঁকে বোঝাব যে আমি ইচ্ছে করে জেলে যাচ্ছি না। শীতকাল; জেলের সেল ঠাণ্ডা, নোংরা, পোকা-মাকড়ে কিলবিল করছে। কিছুক্ষণ আমরা দু'জনে একটু উৎফুল্ল হবার চেষ্টা ক'রে নীরব হয়ে গেলাম। বাবার কথা ভেবে একেবারে মুষড়ে পড়লাম। তবু আশা যে তিনি বুঝবেন। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লাম; জেগে উঠলাম শিকলের ঝনঝনানি আর গেট খোলার শব্দে। দেখলাম আলো এবং কণ্ঠস্বর এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সেলের দরজা খুলে প্রবেশ করল মেট্রন, জেলর, আর দুজন প্রহরী। মেট্রন বলল অর্থদণ্ড আদায় হওয়ায় আমরা মুক্ত। বিশ্বাসই হল না বাবা অর্থদণ্ড দিতে স্বীকার করবেন। যাই হোক, দেওয়া যখন হয়েছে তখন বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে অফিস ঘরে গিয়ে দেখলাম একজন উকিল বন্ধু অপেক্ষা করছেন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। জিগগেস করলাম, 'কে টাকা দিল।' তিনি বললেন, 'বলতে পারব না।' আমার বাবাও দেননি, আমার ভাইঝির বাবাও না। আমাদেরই কোনো এক বন্ধু টাকা দিয়ে আত্মগোপন করেছেন। মাঝ-রাত কেটে গিয়েছে আমাদের মুক্তি পেতে। ঠিক বারো ঘণ্টা কাটিয়েছি জেলে। বাড়ি পৌঁছে দেখি সব অন্ধকার। কেউ আশাও করেনি, কেউ জানেও না যে আমরা মুক্ত। শুধু মা জেগে, ব'সে রামায়ণ পড়ছিলেন। ভোরবেলা গেলাম বাবার ঘরে। আমার পুনরাবির্ভাবে মায়ের চেয়েও বাবা আশ্চর্য হলেন বেশি।

আমাকে দেখে খুশি হলেও, অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে শুনে ভারি বিরক্ত হলেন। সকালের কাগজে দেখলাম আমাদের গ্রেপ্তারের সম্বন্ধে বাবার বিবরণী। অনেক বন্ধুবান্ধব এসে জিগগেস করেছিল, 'আপনি না দিলেও ফাইনটা কি আমরা দিয়ে দেব।' বাবা চ'টে আগুন। বলেছিলেন, 'কেউ এই টাকা দিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। একটা আদর্শের জন্যেই না না-দেওয়া! যিনি দেবেন তিনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করবেন, এমন কি শত্রুর কাজ করবেন।' তবু বাবার অসুস্থতা দেখে নিজের দায়িত্বেই কেউ দিয়ে দিয়েছেন। বহু দিন পরে জেনেছিলাম তিনি কে। জেল থেকে আসার কয়েকদিন পরে যুব-সঙ্ঘের হয়ে আশে পাশের গ্রামগুলিতে ঘুরে এসে একদিন দেখি বাবার চিঠির মধ্যে আমাকেও ছোট একটি চিঠি লিখেছে জওহর। তাতে আছে, 'শুনলাম তুমি মাল্য, অভিনন্দন পাচ্ছ অনেক। কিন্তু তোমার কোন কাজের জন্যে পাচ্ছ এ-সব ? কয়েক ঘণ্টা জেলবাস নিয়ে মহাকাব্য রচনা হয়না। যাই হোক, আশা করি এর জন্য তোমার মাথা ফেঁপে উঠবে না। অবশ্যি, মাথা না থাকার চেয়ে ফাঁপা মাথাও ভালো!'

বাবা নিজে ভালো হচ্ছি মনে করলেও দিন দিন তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগল। বাবার কথা মনে হলেই মনে পড়ত তাঁর শক্তি-স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। সেই তিনি আজ দুর্বল, রোগগ্রস্ত। মুখ বেশ ফুলেছে। দেহ একটু ন্যুব্জ। দেখে ভারি কষ্ট হতো। শেষে তিনি শয্যাশায়ী হলেন। তখনও বুঝতে পারিনি মৃত্যুর দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। কিছুতেই যেন মনে হতো না মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে। সব কিছুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ক'রে তিনি জয়ী হয়েছেন চিরকাল। এবারও

তিনি জয়ী হবেন—প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং মৃত্যু হলেও হবেন—এই ছিল আমার স্থির বিশ্বাস। কিন্তু তা হবার নয়।

৫

'মহাপ্রাণ যাঁরা, তাঁরা উচ্চ শৈলশিখরের মতো। ঝড় তাঁদের আঘাত করে, মেঘেরা তাঁদের ঘিরে ধরে, কিন্তু সেই উর্ধ্বতায় আমরা ভালো ক'রে নিশ্বাস নিয়ে শক্তি অনুভব করি যা আর কোথাও সম্ভব নয়।' —রমা রলাঁ

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস। বাবার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় জওহর এবং ভগ্নীপতি রঞ্জিত বিনা সর্তে মুক্তি পেল। বারো বছর আগের সেই ঘটনা এখনও বেদনাতুর হয়ে জেগে ওঠে আমার মনশ্চক্ষে। জওহর পৌঁছেই সোজা চলে গেল বাবার ঘরে। বাবার চেহারার সেকি পরিবর্তন! মুখ ফুলে উঠেছে। এই দৃশ্যে প্রবেশের মুখেই জওহর একটু থমকে দাঁড়াল। তারপরেই পিতাপুত্রে নির্বাক আলিঙ্গন। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বিছানার উপর বসতেই তার চোখ ভরে এল জলে। কিছুতেই সে রোধ করতে পারল না চোখের জল। জওহরকে দেখে বাবার চোখে যে আলো জ্বলে উঠেছিল, যে আনন্দ ফুটে উঠেছিল তা আমি কখনও ভুলব না। আমাদের সকলের শুধু পিতা নন, পরম বন্ধু যিনি, যাঁকে সে এত ভালোবেসে এসেছে এতদিন— সেই পিতার রোগ-শয্যার কাছে এগিয়ে যেতে জওহরের সে আর্তরূপও আমি কখনও ভুলব না।

বাবার সেই রোগের দিনগুলি শুধু যে উদ্বেগ আর কষ্টে বিধুর হয়ে উঠেছিল তাই নয়, শোকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। দিন দিন তাঁর আয়ু ক্ষীণ হয়ে এলেও ঠিক যেন কিছুতেই বিশ্বাস

হতো না মৃত্যু এত কাছে। এ পর্যন্ত মৃত্যু আমাদের পাশ কাটিয়ে গেছে। তাই জানি না তার রূপ।

জওহর যেদিন মুক্তি পেল সেদিন ভারতের চারদিকে আরও অনেকে মুক্তি পেলেন। গান্ধীজী তাঁদের মধ্যে প্রথম। তিনি বাবার অবস্থা খারাপ শুনে যারবেদা জেল থেকে সোজা চ'লে এলেন—পুনা থেকে এলাহাবাদ। ভারি খুশি হলেন বাবা। তাঁর উপস্থিতিতে যেন একটু শান্তিও পেলেন। আরও অনেকে যাঁরা মুক্ত হয়েছেন তাঁরা ভিড় ক'রে এলেন আনন্দ-ভবনে—বোধহয় তাঁদের শেষ-শ্রদ্ধা জানাতে। যেখানে বিরাজ করতো শুধু হাসি আর আনন্দ, সেখানে আজ এত অতিথি সমাগম সত্ত্বেও বিরাজ করছে নিরানন্দের স্তব্ধতা। নীরবে লোক আসা-যাওয়া করছে। কেউ করছে কোনো কাজ, কেউ বা ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনি। সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাদে ঘন।

মা, আমি, কমলা, জওহর, স্বরূপ—সবাই বাবার চারদিকে সব সময় ঘুরঘুর করছি। রাতে পালা ক'রে তাঁর কাছে আমরা ঘুমোতাম—যদি কখনো তাঁর কাউকে প্রয়োজন হয়। অনেকবার দেখেছি: আমি কাছে রয়েছি: বাবা জল চাইছেন—আমাকে ত্যক্ত করবার জন্য সসঙ্কোচে। আমার ভারি রাগ হতো বাবার এই সঙ্কোচ দেখে। এত যখন অসুখ তখন অন্যের কথা না হয় একটু কমই ভাবলেন। দিনে দিনে আমাদেরই উদ্বেগাকুল চোখের সামনে তিনি মরণের পথে এগিয়ে চলেছেন। বাধা দেবার কোনো হাতই নেই আমাদের। শেষ পর্যন্তও তাঁর হাসি-তামাশা করার স্বভাব বজায় ছিল। কখনও দেখি গান্ধীজীর সঙ্গে রসিকতা করছেন, কখনও মাকে ঠাট্টা ক'রে বলছেন, 'তোমার আগেই চললাম; ও-জগতে গিয়ে অপেক্ষা করব।' যা হবেই তার

ভয়ে তাঁকে ভীত দেখিনি কখনো। সারাজীবন তিনি যুদ্ধ করেছেন আর জয়লাভ করেছেন। তাই বিনা যুদ্ধে মৃত্যুর কাছেও তিনি হার মানেননি। তাঁর ক্ষীয়মাণ শক্তি দিয়ে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি যুদ্ধ করেছেন—শুধু আর কয়েক বছর বেঁচে থাকবার চেষ্টায়—ভোগ-সুখের জন্যে নয়, তাঁর জীবন-উৎসর্গ-করা কাজের কি ফল হল তাই দেখবার জন্যে। তাঁর এত সাহসকে হার মানিয়ে মৃত্যুই জয়ী হল একদিন।

একদিন বাপুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, 'প্রায় সব সদস্যই যখন উপস্থিত আছেন তখন আমার ভারি ইচ্ছে স্বরাজ-ভবনেই ওয়ার্কিং-কমিটির অধিবেশন হয়।' তাঁর শেষ কথা হল : 'ভারতের ভাগ্য স্বরাজ-ভবনেই নির্ধারণ করুন আমার সামনে। মাতৃ-ভূমির ন্যায়সঙ্গত চরম ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের কাজে আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে দিন। যদি মরতেই হয়—স্বাধীন ভারতের কোলে যেন মরি। শেষ নিদ্রা যেতে চাই পরাধীন-ভারতে নয়, স্বাধীন-ভারতে।'

তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হল দেখে ডাক্তারেরা বললেন, এক্স-রে চিকিৎসার জন্যে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে হবে। বাবা রাজী হলেন না। ডাক্তারদের চেয়ে ভালো ক'রেই তিনি জানতেন, সময় হয়ে এসেছে। যে-বাড়ি তাঁর এত ভালোবাসার, এত গর্বের—সেই আনন্দ-ভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান। কিন্তু ডাক্তারেরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। গান্ধীজীও তাঁদের সঙ্গে একমত। প্রতিবাদ করার শক্তিও তাঁর দুর্বলতায় লুপ্ত। মোটরে তাঁকে ১৯৩১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া হল। এত দীর্ঘ ভ্রমণ সত্ত্বেও পরের দিন মনে হল যেন একটু ভালো আছেন। কিন্তু সন্ধ্যা

নাগাদ অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে এল। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে তবু জ্ঞান একটুও লুপ্ত হয়নি। সব বুঝতে পারছেন। বেলা পাঁচটার কাছাকাছি ডাক্তার বিধান রায় আমাকে ডাকলেন। ডাক্তার আন্‌সারী, জীবরাজ মেহতা এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে তিনিই বাবার চিকিৎসা করছিলেন। বাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবার পিছনে ব'সে তাঁকে ধ'রে রাখতে ব'লে চিকিৎসকেরা চলে গেলেন। আমি তাঁর দেহ ধ'রে রইলাম। কখনও জানতে পারলাম না—বাবাই আমাকে ডেকেছিলেন, না, চিকিৎসকেরা নিজেরাই ডেকেছিলেন আমাকে। কয়েক মিনিট পরে মনে হল বাবা যেন কি খুঁজছেন। আমি ঝুঁকে জিগগেস করলাম, 'কি চাই বাবা।' কথা বলতে পারছেন না। শেষ-প্রয়াসে দুই স্ফীত, স্খলিত হাতে আমার মাথাটা ধ'রে সারা মুখে চুমো খেলেন, যেন শেষ-বিদায় চেয়ে। সেই ঠোঁট তাঁর এমন ফুলে উঠেছে, যে চেনাই যায় না। দাঁতে দাঁত চেপে অমানুষিক আয়াসে উছলে-পড়া চোখের জল রোধ করলাম—একটু জলও তাঁর হাতে পড়তে দিলাম না, একটি শব্দ বেরুতে দিলাম না মুখ থেকে। কিন্তু তাঁর আলিঙ্গন-মুক্ত হতেই হবে—আমি যে আর সামলে উঠতে পারছি না। স্পর্শ-কাতর তিনি। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁর। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না আমার অবস্থা। আমাকে ধ'রে রেখেই জড়িতস্বরে তিনি বললেন, 'সাহস কর্ মা, সাহস কর্।' আর সহ্য করতে না পেরে আমি অন্ধের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে—উঃ! কি কান্না! বেলা যত প'ড়ে আসে তাঁর অবস্থা তত খারাপ হয়। তাঁর ঘরে যাবার আর সাহস নেই। তাই আরও কয়েক-জনের সঙ্গে সারারাত্রি ঘরের বাইরে ব'সে রইলাম। আমি, স্বরূপ, কমলা এবং অন্য আত্মীয়-স্বজনেরা দুঃখে শ্রমে ক্লান্ত হয়ে

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একঘণ্টাও ঘুমোইনি, এমন সময় মাসিমা এসে বললেন, বাবা আর নেই। তাঁর শেষ সময়ে শুধু মা, জওহর আর ডাক্তারেরা ছিলেন তাঁর কাছে।

একে একে সবাই এলাম বাবার ঘরে। খাটের ওপর যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। শান্ত, স্থির মুখমণ্ডল। জীবনের চেয়ে মরণে যেন তাঁকে বেশি মহনীয় মনে হচ্ছে। হৃদয় যদিও কিছুতেই মানতে চায় না, যাঁকে এত ভালোবেসেছি সেই তিনি আর নেই। বাবার মাথায় হাত দিয়ে জওহর বসে আছে পিছন দিকে—যেন আদর করছে। চোখে উন্মুখ অশ্রু। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না, তাই কাঁদতেও পারছিলাম না। গান্ধীজী ঘরে ঢুকে বাবার শয্যা-প্রান্তে গেলেন। চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা। তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন প্রার্থনায় শেষ বিদায় নিচ্ছেন। তারপর গেলেন মায়ের কাছে। প্রথম আর্তস্বরের পরেই সেই যে মা শোকে বিহ্বল হয়ে এককোণে গিয়ে বসেছেন, আর কাঁদেননি। তাঁর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজী বললেন, 'মতিলালজী মরেননি। অনেক দিন বাঁচবেন তিনি!' সেই কথায় আমার চেতনা ফিরে এল—চোখের জল আর বাঁধ মানল না।

বাবার মৃত্যু-সংবাদ চকিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল লক্ষ্ণৌ শহরে। হাজারে হাজারে লোক আসতে লাগল কালাকাংকর প্রাসাদে, তাদের নেতার শেষ দর্শন লাভের জন্যে।

ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে শায়িত ছিল দেহ। ভোর থেকেই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়, আগন্তুকের একটানা স্রোত নিঃশব্দে বয়ে চলল শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে। শয্যাপ্রান্তে গান্ধীজী—নির্বাক দ্রষ্টা।

একাকিনী শোকাচ্ছন্ন মূর্তি মাও ছিলেন ব'সে তাঁরই পাশে—যাঁর সঙ্গে সারা জীবন কেটেছে সুখ, সম্মান, আর কত ক্লেশ ভোগ ক'রে। পাশে দাঁড়িয়েছিল অবসন্ন, মলিন, পাংশুবর্ণ জওহর —একরাত্রেই যেন তার বয়স বেড়ে গিয়েছে। তবু এই দুঃসহ দুর্ঘটনায় তার মুখ শান্ত, সমাহিত।

বাইরে জনতা বেড়েই চলেছে। সকলের মুখে শোকের ছায়া, সকলের চোখে জল। শব্দ নেই কোথাও একটু। ভাষায় সে-শোক প্রকাশ করা অসম্ভব।

জাতীয় পতাকায় বাবার দেহ আবৃত; পাশে জওহর ব'সে। তাঁকে নিয়ে আসা হল এলাহাবাদ। কমলা, স্বরূপ আর আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছানোর জন্যে আগেই মোটরে বেরিয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ্ণৌতে আমাদের বাড়ির চারদিকে অসংখ্য লোক জমে উঠেছিল। যত এলাহাবাদের কাছে আসি জনতা তত বাড়তে লাগল। আনন্দ-ভবনের ক্রোশ দুয়েক আগে থেকে বিপুল জনতা বিপুলতর হয়ে উঠল। তাদের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে আসতে আসতে কানে এল সমবেদনার ধ্বনি। কত লোক কত দূর দূরান্তর থেকে এসেছে বাবাকে তাদের শেষ অর্ঘ নিবেদন করতে। দেখে আমাদের ধৈর্য আর বাঁধ মানে না। বাড়ি পৌঁছলাম—বাড়ি আর সেই বাড়ি নেই—যা হারাল তা আর ফিরে আসবার নয়। বাড়িটা আর বেঁচে নেই। প্রাঙ্গণ ভ'রে গিয়েছে লোকে। সগর্বে যে জাতীয় পতাকা অহোরাত্র উড়ত আমাদের বাড়ির মাথায়—সে-পতাকা অর্ধ-নত। শহরের অনেক পতাকাই আজ ঐ রকম। অবশেষে, শত সহস্র লোকের হৃদয় থেকে বিপুল উচ্ছ্বাস এক প্রচণ্ড ক্রন্দনের বেগে উৎসারিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে শেষবারের মতো বাবার দেহ নিয়ে গাড়ি ঢুকল লোহার ফটকের মধ্যে।

লক্ষ্নৌ থেকে সবাই এসেছে। শেষকৃত্যের জন্যে সকলেই প্রস্তুত। কিন্তু গান্ধীজী আর মা যে-গাড়িতে আসবেন সেই গাড়ি এখনও এসে পৌঁছয়নি। উদ্বেগের সঙ্গে অন্য গাড়ি পাঠানো হল কি হয়েছে দেখবার জন্যে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে এসে পৌঁছলেন তাঁরা। দুর্ঘটনা ঘটেছিল পথে। লক্ষ্নৌ-এলাহাবাদ রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। শোফার কাঁদছিল। পথের মাঝে খানা দেখতে পায়নি। আমাদের বড় ডিলাজ গাড়ি খানার ওপর এসে উল্‌টে গেল। দৈবে গাড়ির দরজা খুলে যেতেই মা আর গান্ধীজী ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আহত হননি। চালকের একটু আঘাত লেগেছিল বটে তবে গাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি।

মা এসে পৌঁছানোর একটু পরেই অনুষ্ঠানাদি শেষ ক'রে বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে বহু পুষ্পাচ্ছাদিত তাঁর দেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়া হল। এত লোকের শোক, সেই পুরুষ-সিংহের প্রতি এত লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা আমাদের শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে একটু সান্ত্বনা আনল। সকলেই কাঁদছে আমাদের মতো; কারও চোখ শুষ্ক নেই। এমনি ভাবে চির-বিদায় দিয়ে এলাম বাবাকে। সেইদিন রাত্রে বাগানে একা বেড়াচ্ছি: মনে হল কিছুই তো বদলায়নি। স্বচ্ছ রাত্রি। তারাগুলি তেমনি সুন্দর, তেমনি উজ্জ্বল। তবু জানি আমার পায়ের তলায় পৃথিবী আর নেই—ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

এত বড় শব-শোভাযাত্রা এলাহাবাদের লোক কখনও দেখেনি। পবিত্র সঙ্গমে শেষকৃত্য দেখবার জন্যে প্রায় এক লক্ষ নরনারীর ভিড় জমেছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু নিস্তব্ধ মানুষের সমুদ্র—অনাবৃত মস্তকে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি সব গ্রাম থেকে হাজার হাজার চাষীরা এসেছে শবানুগমন করবার জন্যে। সব

শেষ হয়ে গেলে গান্ধীজী আর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সেই বিপুল জনতাকে সম্বোধন করলেন। বাপু দাঁড়িয়ে উঠতেই সহস্র কণ্ঠের শোক উথলে উঠল চাপা আর্তনাদে ; কিন্তু পরক্ষণেই সূচিভেদ্য নীরবতা। তিনি বললেন, 'এখানে আজ সমবেত প্রত্যেক নরনারী গঙ্গা-যমুনা-তীরে আমাদের এই বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষের সামনে প্রতিজ্ঞা করুন, যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয় ততদিন যুদ্ধ করে যাব। এই স্বাধীনতাই ছিল মতিলালজীর পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই জন্যেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন।' গান্ধীজীর দীর্ঘ করুণ ভাষণে কাঁদতে আর কেউ বাকি রইল না।

মালব্য বললেন, 'আমার আবেদন আপনারা সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এই জন-নায়কের আত্মত্যাগে জাতিকে স্বাধীনতার পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করুন।'

দুদিন ধ'রে সমস্ত জাতি শোকে মুহ্যমান রইল। স্কুল, কলেজ, ব্যবসা, বাণিজ্য সব বন্ধ। গ্রামে শহরে স্বেচ্ছাকৃত হরতাল। সারা পৃথিবীর থেকে সমবেদনার বাণী উপছে পড়ল।

মৃত্যুর পরে গান্ধীজী এক ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার অবস্থা বিধবার চেয়েও করুণ। স্বামীগত-প্রাণা বিধবার স্বামীর পুণ্যে সম্পূর্ণ অধিকার। আমার কিছুতেই অধিকার নেই। আমি তাঁর মৃত্যুতে যা হারিয়েছি তা আর পূরণ হবার নয়।'

বাবাকে দেখে মনে হতো লম্বা। কিন্তু তাঁর উচ্চতা ছিল সাধারণ ; দেহ সুগঠিত। মুখে বুদ্ধির ছাপ। চোখ দেখলে মনে হতো আমার অন্তরের কথা বুঝে নিচ্ছেন। মাথার গড়ন কি অপূর্ব। আর সব শুদ্ধ কি অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। আমি যখন জন্মাই তখনই তাঁর চুল একটু পেকেছে। আর আমার যখন পনেরো বছর বয়েস তখন সুন্দর তুষার-শুভ্র চুলে তাঁর মাথা ভ'রে গিয়েছে। হঠাৎ তাঁকে

দেখলে মনে হতো বড় কঠোর, তাই লোকে ভয়ে কাছে আসতে সাহস পেত না। তারা কি ক'রে জানবে ঐ আপাত কাঠিন্যের তলায় কি স্নিগ্ধ, কত সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় লুকিয়ে আছে। সে হৃদয় স্পর্শ করতে জানা চাই। ছোট ছেলেদের তাঁর সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব জমে উঠত। এমন শিশু দেখিনি যে দেখেই তাঁর প্রতি অনুরক্ত না হয়েছে। নিজের সন্তানদের তিনি অপরিসীম ভালোবাসতেন, তবে তা বুঝবার উপায় ছিল না। ছেলেবেলায় খুব ভালোবাসতাম তাঁকে, কিন্তু কেমন ভয় ভয় করত। বড় হলে তাঁকে জেনে সে ভয় কেটে গেল একেবারে। আমরা যেন বন্ধু হয়ে গেলাম। আমার অত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না। আর দেখেছি, যে জনসমাবেশেই তিনি থাকুন না কেন, ব্যক্তিত্বের মহিমা তাঁকে সকলের থেকে পৃথক ক'রে রাখত। আর আশ্রিতদের এবং আমাদের মনে হতো তিনি যেন একটি বিরাট বটগাছ, যার ছায়ায় আমরা সবাই পরম নির্ভয়ে আছি। সেই আশ্রয়ের বড় বেশি রকম সুবিধাও আমরা নিয়েছি।

আমরা সকলে ঘিরে থাকলে বাবা ভারি খুশি হতেন। কিন্তু আমাদের একা থাকবার উপায় নেই। সন্ধ্যাবেলাতেই বাবা একটু স্বচ্ছন্দে কথা বলার সুযোগ পেতেন আর সেই সময়েই যত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ের সমাগম। সারাদিন এবং কখনও কখনও অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতেন তিনি। সারাদিন ক্লান্তিকর কাজের পর বাবা খেতে বসেছেন সকলের সঙ্গে টেবিলে, প্রত্যেকের উপর সতর্ক দৃষ্টি ; হাসছেন, রসিকতা করছেন, রাগাচ্ছেন। বাইরের লোকেরা দেখে চিনতেই পারবে না ইনি দিনের বেলাকার সেই গুরুগম্ভীর মতিলাল নেহেরু। কে নতুন রকমে চুল বেঁধেছে, কে নতুন জামা কাপড় পরেছে, তা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়াত না। আর

এমন অস্বস্তি লাগত যখন তিনি তাকিয়েই মনের কথা বুঝে নিতেন। তাঁর কাছ থেকে সুখ্যাতি পাওয়া খুব বিরল ব্যাপার। তাও এক-আধবার শোনা যেত। আমার মনে আছে বাবা তাঁকে সুখ্যাতি করলে মা কেমন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠতেন। কখনও বা পুরনো কথা বলতে বলতে ভুলে যেতেন চারদিকে আমরা বসে আছি। মায়ের সঙ্গে তিনি অতীতে মগ্ন হয়ে যেতেন। এই সব স্মৃতি ভোলা যায় না, মনে বাসা বাঁধে এরা। তাই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে শুভ্রকেশী এক দম্পতির দৃশ্য—যাঁরা সারা জীবন একসঙ্গে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে অনাহত অবস্থায় পরস্পরের প্রতি গভীর অনুভূতি ও প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দিনের কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাবার মন সবচেয়ে ভালো থাকত। খাবার আগে তাঁর দু'ঘণ্টা বিশ্রাম, খাবার পরে আবার কাজ। সাড়ে ছ'টার কাছাকাছি বন্ধু-বান্ধব আসতে শুরু ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই জন চব্বিশ জমে উঠতেন। লনে চেয়ার টেবিল সাজানো হতো; হাসিতে খুশিতে ঠিকরে পড়ত তাঁর রসিকতা; গুণমুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে এমনি ক'রে বসত বাবার সভা। বাবাই প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন আর সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর কোনো স্মৃতিকথা অথবা কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ। অন্যেরাও মাঝে মাঝে গল্প যে না-যোগাতেন তা নয়।

বাবাকে বুঝত খুব অল্প লোক। প্রথম প্রথম তাদের মনে হতো, বাবা কঠোর, অনমনীয়, একেবারেই দুষ্প্রবেশ্য। মাঝে মাঝে তিনি ওরকম হতেন বটে। কিন্তু তাঁকে চিনত যারা তারা জানত তাঁর চরিত্রের স্নিগ্ধতা, তাঁর অপরূপ ব্যক্তিত্ব এবং আকর্ষণী-শক্তি। সামাজিক উৎসব আয়োজনে অনেক তরুণেরই হিংসার উদ্রেক করত তাঁর এই আকর্ষণী-শক্তি। তাঁর স্বভাবটা ছিল রাজসিক,

একটু কর্তৃত্ব করতেই তিনি চাইতেন, কিন্তু তাঁর গর্বিত ভঙ্গীতে এমন একটা গরিমা ছিল যে লোকে তাঁকে আপনা থেকেই সম্মান করত। কোনো নীচতা, দুর্বলতা দেখিনি তাঁর কোনোদিন। দেহে মনে শক্তিমান—আমার কাছে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। অনেক ঘুরেছি; অনেক বড় বড় লোককে দেখেছি; তাঁদের গুণপনা দেখে মুগ্ধও হয়েছি। তবু বাবার মতো এমন মহান্ অপূর্ব ব্যক্তিত্ব চোখে পড়েনি। হয়তো আমার কথা পক্ষপাত-দুষ্ট। বড় বেশি ভালোবাসতাম, বড় বেশি শ্রদ্ধা করতাম ব'লে আমার দৃষ্টিতে হয়তো মোহ জড়িয়ে আছে।

একটি দোষ তাঁর ছিল—সহজেই তিনি চ'টে উঠতেন। তবে চ'টে-ওঠার ধাতটা আমাদের বংশগত। নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি গভীর ভালোবাসাটাই ছিল তাঁর একমাত্র দুর্বলতা। বাইরে থেকে দেখে লোকে ভাবত তিনি খুব কড়া বাপ; কিন্তু আসলে তাঁর মনটা ছিল ভারি কোমল, স্নেহপ্রবণ। জওহর কোনোদিন সংসারের ঝামেলা পোহাতে চাইত না। বাবাকেই সব দেখতে হতো। কখনও জানতেও পারিনি কত ভাবনা তাঁকে ভাবতে হতো। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন, আমরা সুখে নির্ভাবনায় কাটিয়েছি—ভেবেছি বাবা তো রয়েছেন, সব ঠিক থাকবে। ভাবনা-চিন্তা কাকে বলে জানবার অবকাশ হয়নি তাঁর ভালো-বাসার আওতায়। তাঁকে ভাবলেই যেন মনে বল আসত। তিনি ছিলেন শক্তির স্তম্ভ—জীবনের সমস্ত মলিনতা, দুঃখকষ্টের হাত থেকে আশ্রয়। তিনি যখন চলে গেলেন আমরা পড়লাম অকুল পাথারে, কিছুতেই তাঁকে ছাড়া এই জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এতবড় যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রনীতিবিদের

মৃত্যু দেশের পক্ষেও মহা দুর্ঘটনা। বাবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল বিস্ময়কর। তাঁর অমূল্য পরিচালনা থেকে দেশ এই বিপদের সময় বঞ্চিত হল। শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে একজন নেতা বলেছেন, 'তাঁর আত্মত্যাগ অলৌকিক। স্বাধীনতার সংগ্রামে' তিনি স্বার্থের পর স্বার্থ ত্যাগ করে চলতেন; তাঁর ত্যাগের কোনো পরিমাণ পাইনি। ভারতের স্বাধীনতার জন্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভারত যখন তৈরি করবে তার স্বাধীনতার সৌধ, তখন বর্তমান ভারতের স্থপতি মহাত্মা গান্ধীর পাশেই হবে মতিলালজীর গৌরবের আসন।'

৬

'বাইরের দুনিয়ায়, রাগ আর ভালোবাসা
তাই নিয়ে চলে মনোরঞ্জন,
আমাদের তরে শুধু ঝুলছে ফাঁসির দড়ি
কারা-শৃঙ্খল বাজে ঝন্‌ঝন্‌।'—গালিব

গান্ধীজী তখন দিল্লীতে বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছেন। জওহর বাবার মৃত্যুর পরেই দিল্লী গেল তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। পারিবারিক বহু ব্যাপারের মীমাংসা তার অনুপস্থিতির জন্যে সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখতে হল। দিল্লীতে কর্মব্যস্ত থাকলেও এ-কথা সে ভোলেনি যে সে-ই এখন বাড়ির কর্তা। আমরা সকলেই তার উপস্থিতি চাইছিলাম, বিশেষ ক'রে মা। তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। আসতে দেরি হচ্ছে দেখে জওহর আমাকে লিখল, 'কতদিন যে এখানে থাকতে হবে জানি না। আশা করেছিলাম পুরো এক সপ্তাহ বাড়িতে থেকে তোমাদের সহায়তায় পারিবারিক ব্যাপারগুলো চুকিয়ে ফেলব। এতদিন বাবা ছিলেন; কোনো ভাবনাই এ-পর্যন্ত আমাদের ভাবতে হয়নি। তাঁর দূরদৃষ্টির ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাঁর ভালোবাসা ঢেকে রেখেছিল আমাদের। সকলকেই জীবনে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তিনি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাদের হাত থেকে। সমস্যা এলেই মনে হতো বাবা আছেন, ভয় কি। এখন আর তিনি নেই। যত দিন যাচ্ছে, তাঁর অভাব তত চেপে বসছে মনে। ভীষণ একা লাগছে। তবু আমরা

তাঁর ছেলে মেয়ে। তাঁর শক্তির কিছু আমাদের আছেই, কিছু আছেই তাঁর সাহসের। সমস্যা, পরীক্ষা যতই আসুক না কেন সব কিছু জয় করে উত্তীর্ণ হবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়াব তাদের সামনে।' জওহরের দুঃখের গভীরতা চিঠিতেই স্পষ্ট। আমাদের অবস্থাও তারই মতো। বাবাকে না হলে কি ক'রে যে সব ঠিক হবে তা কিছুতেই মাথায় এল না। জওহর কিন্তু যোগ্যতার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গেই আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের সমস্ত ভারই গ্রহণ করেছিল। বাবার স্থান সে-ই গ্রহণ করল, আমরাও দিনে দিনে সব কিছুর জন্যে তারই উপরে নির্ভর করতে শুরু করলাম। আর এখনও তাই করি।

জওহরের চিঠি মনে যেন শান্তির প্রলেপ দিয়ে দিল। এত সান্ত্বনা আর কিছুতেই পাইনি। জওহর জানে না, কত সময়ে নানা ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হয়ে হতাশায় যখন ভেঙে পড়েছি, তখন বারো বছর আগেকার লেখা ঐ চিঠি আমার মনে আবার সাহস এনে দিয়েছে।

সে-বছর করাচীতে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন। জওহর এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে মা আর আমিও চললাম। জওহরের শরীর মোটেও ভালো নয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে থেকেই তার শরীর খারাপ। তার ওপর বাবার অসুখের দুশ্চিন্তা এবং মৃত্যুর আঘাত। তার যাকে বলে 'লোহার শরীর,' সেই শরীরেও এত সহ্য হল না। ডাক্তারেরা বললেন দীর্ঘ অবকাশ নিতে। তাই জওহর মেয়ে আর কমলাকে নিয়ে তিন সপ্তাহের জন্যে বেড়াতে গেল লঙ্কায়। সেখানকার লোকেদের আদর আপ্যায়নে অভিভূত হয়ে গেল তারা। ফিরবার পথে জওহর লিখেছিল, 'সব জায়গাতেই অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা পেয়েছি। এক জনতা থেকে আর এক জনতায়

যাওয়ার পথে, পথের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষমান অসংখ্য লোক দেখে অবাক হয়ে ভাবলাম : এর অর্থ কি। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগা ছাড়াও কোনো গভীর অর্থ এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে। হঠাৎ মনে হল ঠিকই তো। এরা এসেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আমরা তো সেই সংগ্রামের প্রতীক মাত্র। এমন একদিন ছিল, এই সেদিনও, যখন বিদেশে ভারতবাসীকে মাথা নিচু ক'রে চলতে হতো। কিন্তু এখন এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে সেই লজ্জা একটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেছে। আজকে ভারতবাসী হওয়া, বিশেষ ক'রে সেই সংগ্রামে যোগদানের কষ্ট সহ্য করা গৌরবের ব্যাপার। ভারতবাসী আজ যেখানেই যাক এই নতুন ভারতের গৌরব সে বহন ক'রে নিয়ে যায়।' আজ পর্যন্তও জওহর কোনো ব্যক্তিগত সম্মান বা স্নেহমর্যাদা পেলে সে মনে করে এ তার প্রাপ্য নয়—সে ভারতের মুক্তিকামী সন্তান, যে-সন্তান তার সব কিছু দেশকে দিয়েছে, প্রয়োজন হলে প্রাণও দিতে প্রস্তুত—তাই উপহার-স্বরূপ এ-সব তার উপর বর্ষিত হয়।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি সত্ত্বেও দেশের অবস্থা একই রইল। চুক্তি পালনে সরকারের কোনো ইচ্ছাই দেখা গেল না; জাগ্রত জনগণও চাইল না তাদের সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক। যুক্ত-প্রদেশের চাষীদের অসন্তোষ থামল না। গভর্ণমেণ্ট এই চাষীদের দমনের জন্যে অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করতে লাগল। চাষী-সমস্যার আলোচনা হবে না—এ প্রতিশ্রুতি না দিলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন গভর্ণমেণ্ট নিষেধ ক'রে দিল। এই সমস্যার জন্যেই অধিবেশন আর তারই আলোচনা হবে না, এটা নিতান্তই হাস্যকর। কাজেই এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া

অসম্ভব। গোল-টেবিল-বৈঠক থেকে গান্ধীজী শিগগিরই ফিরবেন। জওহর এবং অন্যান্য সবাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। অধিবেশন তাই স্থগিত রইল। তা সত্ত্বেও গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা তাদের হল না!

বম্বে যাওয়ার পথে, এলাহাবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে, পথি-পার্শ্বে এক স্টেশনে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার হল জওহর। গোল-টেবিল-বৈঠকে যোগদান ক'রে দুদিন পরে ইংলণ্ড থেকে ফিরলেন গান্ধীজী। তিনি আশা করেছিলেন সিঁড়ির উপরেই দেখবেন জওহরকে। তার বদলে শুনলেন জওহর শুদ্ধ আরও অনেকে গ্রেপ্তার তো হয়েছেই, প্রদেশে-প্রদেশে অসংখ্য অর্ডিন্যান্সও জারী হয়েছে। পাশার দান পড়ল; আবার আরম্ভ হল যুদ্ধ। ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজী এবং বল্লভভাই বিনা বিচারে আটক হলেন আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আন্দোলন উঠল চরমে। আমরা, যারা আগের সব আন্দোলনে তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিনি, তারা এবার সমস্ত শক্তি, উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়লাম। বয়স এবং ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে মা-ও পিছিয়ে রইলেন না। শহরে এবং আশে-পাশের গ্রামে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁকে দেখে অবাক লাগত আমাদের। সারা জীবনই তিনি সুস্থ দেহের পরিবর্তে, অস্বাস্থ্য নিয়েই কাটিয়েছেন। হঠাৎ যেন তিনি কোন উর্ধ্বলোক থেকে শক্তি-সামর্থ্যের বর-লাভ করলেন: আমাদের মতোই এমন কি আমাদের চেয়েও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি।

আমি, আমার বোন আর আমাদের কয়েকজন সহকর্মীদের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী হল—এক মাসের জন্যে আমরা কোনো সভা-সমিতি, শোভা-যাত্রা বা হরতালে যোগ দিতে পারব না,

বা এ-সবের উদ্যোগ-আয়োজন করতে পারব না। দু’ সপ্তাহ পরেই স্বাধীনতা-দিবস। ঠিক করলাম ঐ দিন পর্যন্ত চুপচাপ থাকব। ২৬শে তারিখে যে-সভা হল সে-সভার মতো অত বড় সভা কোনোদিন আর হয়নি আমাদের শহরে—মা সভানেত্রী। আগুনের মতো বক্তৃতা দিলেন তিনি। সভা শেষ হবার আগেই পুলিশের লাঠি-চালনায় বাধ্য হয়ে সভা ভেঙ্গে গেল। অনেকে গ্রেপ্তার হল, অনেকে গুরুতর আহত হল। নিষেধাজ্ঞা অমান্য সত্বেও আমাদের গ্রেপ্তার করল না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন সকাল সাড়ে ন’টার সময় পুলিশের গাড়ি এসে উপস্থিত, সঙ্গে ইন্‌স্‌পেক্টর। শুনলাম আমরা গ্রেপ্তার হয়েছি—আমি আর আমার বোন। জিনিসপত্র বেধে-ছেঁদে মা এবং অন্যান্য সবার কাছে বিদায় নিয়ে চললাম কারাগারে।

এই হল সত্যিকারের জেলের আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আগে একবার গিয়েছিলাম বারো ঘণ্টার জন্যে। আমাদের কি হবে এই ভেবে আমরা মোটেই উদ্বিগ্ন হইনি। শুধু ভাবছিলাম আমাদের ছোট্ট ক্ষীণ মা’র কথা, যাঁকে একদিনের আনন্দমুখর সেই বিশাল জনশূন্য বিষাদে পূর্ণ পুরীতে রেখে চলে এসেছি। তাঁর চোখের সামনেই তাঁর ছেলেমেয়েরা একে একে জেলে চলে গেল তাঁকে একা ফেলে, শুধু করার জন্য রেখে গেল তাদের অসমাপ্ত কাজ; এটা সহ্য করা তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হয়েছিল। শরীর ক্ষীণ হলেও মনে তাঁর সিংহীনীর বল। শুধু তাঁর বোন আর তিনি—অপরিসীম একাকিত্ব। মাসিমারও সাহস তাঁরই মতো। সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প তাঁদের কোনোদিন একটুও শিথিল হয়নি।

সেই চিরপ্রিয় গৃহ থেকে আমাদের নিয়ে আসা হল সদর জেলে। গিয়ে দেখলাম আমাদের সহকর্মীদের অনেকেই সেখানে রয়েছে—

হাসিমুখে সবাই তারা সব কিছু সইবার জন্যে প্রস্তুত। আনন্দ হল তাদের দেখে। ওজন-টোজন করে নিয়ে গেল আমাদের ভিতরে। জেলে মেয়েদের আলাদা রাখবার বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল না। বিচার শেষে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হতো অন্য জেলে। মেয়েদের শুধু একটা ইয়ার্ড ছিল বটে; সেখানে যত কদর্য স্ত্রীলোক এবং নানা কদর্য রোগে ভুগ্ত তারা। বিচারের আগে তিন সপ্তাহ এবং পরে চার দিন এইখানেই আমাদের রাখা হল এক এক ঘরে বারোজন ক'রে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গত যুদ্ধে আহত বিকলস্নায়ু একজন ইংরাজ, রোজ সকালে আসত একবার। নিজের চোখে দেখে যেত সে, আমরা কেউ পালিয়েছি কিনা। একদিন আমার আর আমার এক বন্ধুর সেলের বাইরে আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমাদের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি, জলদি, তোমাদের জন্যে আমি সারাদিন ব'সে থাকব নাকি? আমার এদিকে আবার এক টেনিস্ ম্যাচে যাবার কথা রয়েছে। এখানে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে—এই যাচ্ছেতাই জায়গায়?' বিরক্ত আমিও হয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিলাম কথা, 'এই কদর্য জায়গায় আপনার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ লাগে আমাদের। আর টেনিস ম্যাচ—আমরা যদি রোজ না দেখে থাকতে পারি, আপনিই বা একদিন পারবেন না কেন?' রাগে নীল হয়ে গেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কিন্তু ভাগ্য ভালো, বলল না কিছু।

প্রথম ক'দিনের নতুন অভিজ্ঞতা কখনও ভুলবার নয়। হরেক রকমের পোকা কিল-বিল করছে ঘরগুলোয়। পাছে বিছানায় ঢোকে এই ভয়ে কয়েক রাত ঘুমতেই পারা গেল না। একটা নোংরা চটচটে পোকা হাত কি পা বেয়ে উঠতে পারে মনে হলেই গা ঘিন্‌ঘিন্ ক'রে উঠত। এক-আধবার উঠেও ছিল প্রত্যেকেরই

গায়ে। পরে প্রতিদিন শোবার আগে সমস্ত ঘরগুলো পরিষ্কার করা হতো ব'লে যে ক'দিন ছিলাম আর অস্বস্তিকর কিছু ঘটেনি। বিচারের আগের ক'দিন বাইরের লোকজনের আসায় বাধা ছিল না। মা আসতেন রোজ। অবশেষে এলো বিচারের দিন। মনে আমাদের উত্তেজনা। ছ'মাসের জন্যে সবাই তৈরি হয়েই ছিলাম। শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আমরা সবাই বসেছিলাম। এক এক জনের নাম ডাকা হয় মাত্র, আর বিচার শুরু হয়। আমরা বিচারে কোনো অংশ গ্রহণ করতে রাজী হইনি। প্রথমে পালা এল আমার বোনের। অতি নিম্নস্বরে ম্যাজিস্ট্রেট একবছরের সশ্রম কারাবাস এবং অর্থ-দণ্ডের আদেশ দিতেই আমরা সকলে অবাক হয়ে গেলাম। আমার ভাগ্যে শুধু সশ্রম কারাবাস; অর্থদণ্ড নেই। একে একে সব মেয়েদেরই বিচার হয়ে গেল। মাত্র আর দু'জনের এক বছর ক'রে জেল হল। অন্যদের সব তিন মাস থেকে ন'মাস পর্যন্ত। চার দিন পরে, একদিন রাত এগারোটার সময়, সব লক্ষ্ণৌ চালান হয়ে গেলাম। সেখানে কাটল সাড়ে এগারো মাস। শান্ত শিষ্ট হয়ে থাকার জন্যে পনেরো দিন আগে ছাড়া পেয়েছিলাম।

এক অত্যন্ত শীতের সকালে আমরা পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। সামনেই নিষ্করুণ কারাপ্রাচীর বীভৎস ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে। মনটা একটু দমে গেল। এক বছরের জন্যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগ থাকবে না। এই প্রথম বুঝলাম কারাজীবন মানে কি। কিন্তু প্রত্যেকের মনে দৃঢ় পণ কিছুতেই ভয় পাব না; বহু দুঃখের মধ্যেও আমাদের নেতার মহত্ত্বে এবং আমাদের সংগ্রামে আমাদের বিশ্বাস ছিল অটুট।

জেলের অফিসে জিনিসপত্র পরীক্ষা ক'রে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল ভিতরে। আমাদের ব্যারাক দেখিয়ে দিল মেট্রন, আর

ব'লে দিল কি কি করতে হবে, কি ভাবে থাকতে হবে আমাদের, ইত্যাদি। জানিয়ে দিল—সামনে উঠানটায় আমরা বেড়াতে পারি কিন্তু পাঁচটার সময় তালাবন্ধ হতে হবে। শুনে দমে গেলাম। বিছানাপত্র তেমন সুবিধার নয়। সেগুলো বিছিয়ে রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে, কেউ কেউ ঠিক করলাম জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে নেব।

সকালবেলা। কয়েদীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেউ হাত মুখ ধুচ্ছে, কেউ অন্য কাজ করছে। ধীর পদক্ষেপে আমরা পাশ দিয়ে যেতেই কেউ কৌতূহলে একটু মুখ তুলে তাকাল, কেউ একটু সদয় হাসিও হাসল, কিন্তু কয়েকজন বয়স্ক, পুরনো কয়েদী আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল গোমড়া মুখে। একজন অতি তাচ্ছিল্যভরে আমাদের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল। পরে জেনেছিলাম সে-বুড়ী অতিশয় বদ-মেজাজী, কেবল ছল খুঁজে বেড়ায়। সে আবার প্রহরী।

জেলে প্রতি সোমবার প্যারেডের দিন। তার মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসে পরিদর্শনে। ভোর পাঁচটা থেকেই ধোয়া-পোঁছার হুড়োহুড়ি লাগে। ধবধবে পোশাক পরিয়ে কয়েদীদের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়—প্রত্যেকের সামনে চক্‌চক্ করছে লোহার থালা।

আমাদের ব্যারাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলে আমরা কি-রকম ব্যবহার করব এই নিয়ে আমাদের মেট্রনের ছিল ভারি ভাবনা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলে কয়েদীদের উঠে দাঁড়ানোর নিয়ম। কোনো কোনো জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন। তাই আমাদের নিয়ে মেট্রনের ভাবনা।

প্রথম পরিদর্শন সুষ্ঠু ভাবেই সমাপ্ত হল। পরিদর্শক বেশ ভদ্র ; জিগ্‌গেস করলেন আমাদের কোনো অভিযোগ কি চাহিদা আছে

কিনা। আমার সঙ্গীরা কেউ চাইল বই, কেউ বা আর কিছু। আমার ইচ্ছা কারাবাসে কিছু পড়াশুনা করি। তাই বললাম, 'আমার কয়েকখানা ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান বই, কয়েকখানা শর্ট-হ্যাণ্ডের বই 'আর তিনখানা অভিধান চাই। তবে এগুলো সব পড়ার বই। খান তুই উপন্যাসও যেন ঐ সঙ্গেই আসে।'

আমি সত্যিই বইগুলি চেয়েছিলাম; তখন জানতাম না যে বন্দীরা একসঙ্গে, অভিধান সমেত ছ'খানার বেশি বই পেতে পারে না।

একটু ইতস্তত ক'রে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, 'কর্তৃপক্ষকে ব'লে আপনার জন্যে জেলের মধ্যে একটা গ্রন্থাগার খুললেই ভালো হয় না কি? তাতে আপনার পছন্দ ক'রে নেওয়ার সুবিধে হবে।' ভাবছি কি উত্তর দেব, দেখলাম ভদ্রলোকের চোখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি। কাজেই উত্তর দিলাম, 'আপনার বিশেষ কষ্ট না হলে সে-তো খুব ভালোই হয়। জেলে বসে শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে চাই না। আশা করি, শিগগির বইগুলো পাব।' শেষ পর্যন্ত বইগুলি পেয়েছিলাম—দীর্ঘ তু'মাস অনেক ভাবনা চিন্তার পর কর্তৃপক্ষ বই পাঠালেন।

প্রত্যেকের ছ'খানা শাড়ি আর অন্য পরিধেয় যৎসামান্য বরাদ্দ। নিজেদের কাপড়-চোপড় নিজেদেরই কাচতে হতো, সেটা মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। কারণ মোটা পুরু খদ্দর, জলে ভিজে দ্বিগুণ ভারী হয়, নিঙড়ানো শক্ত। জেলে, অন্যান্য অনেক কিছুর মতো, এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু খাবার কিছুতেই গলা দিয়ে নামে না। শুধু খারাপ ব'লে নয়, পরিবেশন এমন নোংরা যে দেখলে গা ঘিনঘিন করে। প্রস্তাব পাঠানো হল, আমরা নিজেরা রেঁধে খাব। অনুমতি মিলল। চারজন আর ছ'জনের

এক-এক দল বেঁধে পালা ক'রে আমরা একজন রাঁধতাম, একজন তরকারি কুটতাম আর বাকি ক'জন মাজতাম বাসনপত্র। এই ব্যবস্থায় একটু যেন সুবিধা হল।

আমাদের ব্যারাকে দশজন, কখনও বারোজনও জমে যেত। সারাদিন ঘুরে বেড়াই উঠোনে, কিন্তু পাঁচটা বাজলেই তালাবন্ধ। সকালে আবার উন্মোচন। এই সময়টা আর কিছুতেই কাটে না। কেউ কথা বলতে চাই, কেউ চাই পড়তে, কেউ চাই আলোচনা করতে, কেউ গান করতে—মোট কথা সবাই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কষ্ট ভুলে থাকতে চাই। মাঝে মাঝে পরস্পরের উপর বিরক্ত হয়ে উঠতাম, তবে মোটামুটি মন্দ কাটত না।

বাইরে থেকে দুঃসংবাদ এসে কিছুদিনের জন্য মনের স্থৈর্য বেশ ভেঙে দিত। একবার শুনলাম লাঠি-চালনায় মা গুরুতর আহত হয়েছেন। বিশেষ কিছুই জানবার উপায় নেই। পাক্ষিক পত্র দিন কয়েক আগে লিখে ফেলেছি, তাই চিঠি লেখা বা তার করার উপায় নেই। বোন আর আমি একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলাম। এই রকম অবস্থায় মনে হতো, কি অসহায় আমরা, কত ব্যর্থ আমাদের জীবন, কত দুঃসহ।

আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করার দিনটা আমাদের কাছে পর্বদিনের সামিল। এক মা ছাড়া আমাদের বাড়ির সবাই জেলে। একা তাঁর উপরেই জওহরের সঙ্গে, ভগ্নীপতির সঙ্গে, বোনের সঙ্গে, আমার সঙ্গে দেখা করার ভার। যদি তাঁর শরীর খারাপ হল, কি অন্য কাজে আটকা পড়লেন, তাহলে আর তিনি আসতে পারতেন না। এরকম ঘটলে বড়ই মন খারাপ হয়ে যেত।

প্রতি পনেরো দিন অন্তর ওজন নেওয়া হত আমাদের। দৈবাৎ কারুর ওজন যদি এক আধ পাউণ্ড বেড়ে যেত তাহলে আর রক্ষে

নেই। দাঁড়িপাল্লাকে গালমন্দ! জেলের খাবারকে গালমন্দ! ডাক্তার ভদ্রলোকের প্রাণ যায়। আমার তো মনে হয় আমাদের ব্যারাকে যখনই আসতেন, তখনই বাক্যবাণে ভদ্রলোকের ওজন কয়েক পাউণ্ড যেত কমে। মেয়েদের মহলে আসতে পেতেন শুধু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর ডাক্তার। আমাদের মধ্যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে যারা অত্যন্ত সচেতন তারা পুরুষের সাহচর্যের একেবারে বিরোধী—মুখে একথা বললেও ডাক্তারবাবু এসে যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ তাঁরই সঙ্গে আলাপে মগ্ন থাকত তারা—জেলের সমস্ত অসুবিধার জন্যে তাঁকেই করত দায়ী।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলেছিল এইভাবে। বাইরে ফেলে এসেছি যাদের, তাদের কাছে না পেয়ে জীবন বড় একঘেয়ে, একা লাগত। মাঝে মাঝে আবার ভালোও লাগত বেশ—সবাই মিলে কাজ, পড়াশুনা, আলোচনা নিয়ে দিব্যি মগ্ন থাকতাম।

সব মেয়ে-কয়েদীরাই দেখলাম বেশ আলাপী। কেউ কেউ আবার বেশ চালাক চতুর, আনন্দ দিতে পারে। তারা নাচতে জানে, গান গাইতে জানে। একজন ট্যাশ-মেয়ে তো এসব ব্যাপারে একেবারে ওস্তাদ। অদ্ভুত সে। যৌবনে নিশ্চয়ই মনোহারী ছিল মেরি। ঐ নামেই তাকে আমি উল্লেখ করব। আসল নামটা বলতে চাই না। সে কেবলই ঝগড়া বাধাত ব'লে তাকে একখানা আলাদা ঘরেই রাখা হতো। যেমন চালাক সে, তেমনি একগুঁয়ে। একদিন সে একটু ক্ষণের জন্যে বাইরে থাকার সময় আমার কাছে এসে বলল, 'জানেন আপনি, আমি একজন মস্তবড় ইংরেজ অভিনেত্রীর আত্মীয়। আপনার বিশ্বাস না হতে পারে ; কিন্তু সত্যি কথা।'

'তুমি জেলে এলে কেন মেরি আর কেনই বা শান্ত হয়ে থেকে তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে বাড়ি যাও না!'

'আর বলেন কেন! আপনিও কয়েদী আমিও কয়েদী—একটা গোপন কথা বলি। জানেন তো, আমি অনেকবার জেলে এসেছি, জেল থেকে গিয়েছি। বাইরে গেলেই পুরুষেরা আমার পেছন নেয়, মনে করে আমি ভারি সুন্দরী আর প্রায়ই আমাকে 'আমার সেই অভিনেত্রী বোন ব'লে ভুল করে। এত বিরক্ত করে যে কিছু একটা ক'রে আমাকে জেলে ফিরে আসতে হয়। এখানে অন্তত তাদের হাত থেকে রেহাই পাই।'

একদিন গভীর রাত, চারদিক নিঃঝুম, নিঃশব্দ। সকলে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আমার পাশের মেয়েটি আমাকে ডেকে তুলে দিল; বলল, 'শুনছ?' কান পেতে শুনলাম—মাঝে মাঝে ঘুঙুরের মতো একটা শব্দ আসছে দূর থেকে। জিগগেস করলাম, 'কিসের শব্দ?'

'জানি না তো। কিন্তু গা ছমছম করছে বড্ড। একটা নাচওয়ালী ছিল এখানে—তার ফাঁসী হয়। তার ভূত হয়তো হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে এখনো!'

ভয়ে কেঁপে উঠলাম। জেলেই হোক আর যেখানেই হোক ভূত দেখার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। ভান করলাম, যেন ও-সম্বন্ধে কিছুই ভাবছি না। বললাম, 'মিথ্যে মিথ্যে কি-সব কল্পনা করছ? জেলে কখনও ভূত আসতে পারে?' আমার ধারণা, জেলের মতো জায়গায় ভূতও আসে না। আর সব জায়গায় গেলেও এখানে আসতে তার রুচিতে বাধে। বন্ধুর কাছে এখানে ভূতের আগমন মোটেই অসম্ভব মনে হল না। সে আমাকে দিল এক বকুনি। শব্দ ক্রমে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল; আর শোনা গেল না।

পরের দিন আবার সেই শব্দ। মোটেই স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। জেগে জেগে ভাবতে লাগলাম এটা কিসের শব্দ হতে পারে। কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। তিন রাত্রি ধ'রে এই ভাবে চলল তারপর

চতুর্থ দিন শব্দ আরো জোরে আরো কাছে হ'তে লাগল। ভয়ে কাঠ হ'য়ে অপেক্ষা ক'রতে ক'রতে দেখি কালো পোশাক-পরা একটা মূর্তি একটা ব্যারাকের কোণ ঘুরে চলে গেল—ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ ওর থেকেই আসছে। কয়েক-মুহূর্তের বিহ্বলতার পর চকিতে মনে পড়ে গেল—আরে, এ-তো প্রহরিণী। আনন্দে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম আর কি। প্রহরীর কর্তব্য হ'ল রোজ রাতে মেয়েদের মহল ঘুরে যাওয়া। সে কুড়ের অগ্রগণ্য। তাই রাজ-বন্দিনীদের দিকে আসার আর প্রয়োজন বোধ করত না, দূর দিয়েই চ'লে যেত। তার কোমরের প্রকাণ্ড চাবির গুচ্ছ থেকে আসতো ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ।

মনে করলাম পরের দিন সকালে সকলকে ঘটনাটা ব'লে নিজেদের নিয়েই বেশ হাসাহাসি করা যাবে। আরম্ভ ক'রেই দেখলাম অপর সকলে পরস্পরের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছে! বহু ধরাধরি করার পর তারা বললে যে তারাও শুনেছে ঐ শব্দ; পাছে আমরা ভয় পাই তাই বলেনি। ভূতই বটে!

তবে জেলের সব ঘটনাই এমন হাসবার মতো নয়। কয়েকজন অল্পবয়েসের মেয়ে-কয়েদীদের প্রতি যা ব্যবহার করা হতো—দেখে রাগে রক্ত গরম হয়ে উঠত। কিন্তু আমরা নিরুপায়, কি করব! প্রহরিণীরা কদর্য। তাদের সাধারণ ব্যবহারই অভদ্র। রাজনৈতিক-বন্দীদের প্রতি আবার তাদের ব্যবহার অপমানকর। তারা রূঢ় ভাষায় যখন কথা বলত তখন মেজাজ ঠিক রাখা হতো কঠিন। অসহ্য লাগত যখন দেখতাম অতি তুচ্ছ কারণে কয়েদীদের উপর অপমান চলছে।

কোনো রকমে কাটছে দিন। তীব্র, দুঃসহ শীত কাটল। কি-রকম শীত তা শুধু উত্তরের লোকরাই জানে। আমাদের ঘরে না

আছে দোর, না আছে কিছু। শুধু লোহার গরাদে কতটুকু শীত মানে! তারপরে এলো ভালো কয়েকটা দিন। তারপরেই শুরু হল লু আর ঝড়। শীতের চেয়েও এ অসহ্য। তাও কাটিয়ে উঠলাম আমরা। আকাঙ্ক্ষিত বর্ষা এলো। শীত এলো আবার। ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমার বোন আর আমি ছাড়া পেলাম। কয়েকজন আমাদের আগেই ছাড়া পেয়েছে। পরে এসেছে যারা তাদের ফেলে যেতে হল। বাড়ি যাচ্ছি—তবু এদের জন্যে মন বড় খারাপ হয়ে রইল।

জেলের-জীবন সুখের জীবন নয়। তবু এই অভিজ্ঞতা আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। যে-সব কয়েদীদের সমাজ ভীতিপ্রদ মনে ক'রে দূরে সরিয়ে রেখেছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আনন্দ পেলাম, দেখলাম সমাজের বহু সামাজিক জীবের চেয়ে এরা অনেক ভালো। বাড়ি যাচ্ছি, আনন্দ হচ্ছে মনে। কিন্তু এ-ও না ভেবে পারছি না যে এই হতভাগিনীরা আরো কতকাল পর এখান থেকে যখন মুক্তি পাবে, তখন না থাকবে এদের যাবার কোনো জায়গা, না পাবে কোথাও একটু আশ্রয় বা কারও একটু সাহায্য। নূতন জীবনের কোনো আশাই নেই এদের। জেলে থেকে-থেকে যতটুকু চতুরতা শিখেছে তারই সাহায্যে হয়তো কোনোরকমে কিছুদিন জীবন কাটিয়ে সমাজের ঘৃণায়, অবহেলায়, এর দুয়োর তার দুয়োর ক'রে শেষ পর্যন্ত আবার হয়তো কোনো অপরাধ করে বসবে। প্রয়োজনের, ক্ষিদের তাগিদে বারবার করবে অপরাধ। শেষে হয়তো আবার ফিরে আসবে জেলে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাবার জন্যে।

খবরের কাগজে পড়ি যুবতী মেয়েরা মারাত্মক অপরাধ ক'রে শাস্তি পাচ্ছে; কত স্ত্রীলোক খুন করেছে; কতজন বার বার শাস্তি

পাচ্ছে। এমনও যে হতে পারে ভেবে ভয়ে কেঁপে উঠি। সুখে, স্বচ্ছন্দে, আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসায় মানুষ হয়ে কতটুকু আমরা জানি আমাদের এই দুর্ভাগা বোনদের কত প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। এই রকম ভয়াবহ অপরাধের কথা শুনলে বা পড়লে আমরা রেগে উঠতে সব সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু ওদের মতো অবস্থার দুর্বার চাপে পড়লে আমরা যে কি করতাম তাই ভেবে বিস্ময় লাগে। আমরা ছিলাম নাবালিকাদের কারাগারে—সব কয়েদী-মেয়েরই বয়স একুশের নিচে। সমাজ-পরিত্যক্ত এই মেয়েদের বেশির ভাগই দেখেছি কত স্নেহশীল, বুদ্ধিমতী, কত স্পর্শকাতর। সদয় ব্যবহার পেলে তারা মন খুলে কথা বলে। তবু জীবনের অত্যাচারে ক্ষণিক ক্রোধের বশে যে ভীষণ প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হয়ে আজ এরা দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করছে, আমাদের মধ্যে কতজন সেই একই প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করি, শুধু শোভনতার সীমা ছাড়াতে পারি না—তাই। এই নতুন বন্ধুদের ফেলে যেতে মন একটু খারাপ হল বৈকি। জীবনের কতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি পাচ্ছি, আর এরাই বা পাচ্ছে না কেন।

বাচুলি ব'লে একটি মেয়েকে ভারি ভালো লাগত আমার। মোটা-সোটা, কাঁধ-পর্যন্ত-নেমে-আসা চুল জট বেধে রুক্ষ হয়ে এসেছে। ছাই-রঙের চোখ ; বেশি লম্বা নয়। দেখতে বেশ। তার এই রুক্ষ কাপড়-চোপড়, অপরিচ্ছন্ন চেহারা সত্বেও তাকে প্রথম যখন দেখলাম জেলের কারখানায় সে বুনতে শিখছে তখন বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। এত ছেলেমানুষ সে, মুখের চেহারায় এমন নির্দোষের ছাপ যে ভেবেই উঠতে পারলাম না ও কেন এখানে এসেছে, কিই বা বিরাট অপরাধ করেছে এই নিতান্ত শিশু! তার কাছাকাছি

যেতেই কানে এল আপনমনে সে গান গাইছে। উত্তর ভারতবর্ষের পাহাড়িয়াদের মুখে শুনেছি এই করুণ সুর ; ভারি পেয়ে বসে। জিগগেস করলাম, 'তোমার নাম কি ?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সেও দ্বিধাভরে জিগগেস করল, 'তুমি কে, এখানে এলে কি ক'রে ?' উত্তরে বললাম, 'আমিও একজন কয়েদী।' সে হেসে উঠল ; জিগগেস করল, 'কি করেছিলে ?' 'আমি রাজনৈতিক বন্দী।' সে মাথা নাড়ল বটে তবে কথাটা ভালো ক'রে বুঝল কিনা সন্দেহ। যাই হোক সে বুঝল আমি আলাপ করতে চাইছি এবং আমি কোনো জেল-কর্মচারী নই। নাম বলল নিজের। লজ্জাভরে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আবার শুরু করল কাজ। 'তুমি এখানে কেন, বাচুলি ?' জিগগেস করলাম। বড়বড় সরল চোখে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে সে শুধু বলল, 'খুনের দায়ে।'

বিশ্বাস হল না। বললাম, 'খুন ?' সমর্থনে সে ঘাড় নাড়ল। চোখকানকে যেন অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা যায়। এখনও এত ছেলেমানুষ ; এ খুন করলে কি ক'রে ? নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোনোখানে।

'কেন মেরেছিলে বাচুলি ? এত অল্প বয়েস তোমার ! নিশ্চয়ই তুমি জানতে না তুমি কী করছ। কোনো দুর্ঘটনা হয়তো।' ধীরে ধীরে মুখ তুলে আবার সে আমার দিকে তাকাল। সে চোখে হাসি নেই আর ; তার বদলে এসেছে ভয়, ঘৃণা। তার মুখের স্বাভাবিক কোমলতা কোথায় মিলিয়ে গেল। এই তার কাহিনী ঃ "যাকে খুন করেছি—সে আমার স্বামী। নিষ্ঠুর ছিল সে। আমাকে মেরে প্রায়ই ঘরে বন্ধ ক'রে রাখত। ঘরে খাবার থাকলেও খেতে দিত না ; নিজে খেয়ে শেষ করতে না পারলে ফেলে দিত।

তাকে খুশি করতে হাজার চেষ্টা করেছি। তবু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে নতুন নতুন পন্থা সে বার করত। সে দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। সবে চোদ্দ বছর বয়সে যখন আমার বিয়ে হয় তখন দেবদেবীদের সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, মা যেমন ব'লে দিয়েছেন তেমনি ক'রে তাকে খাওয়াব, যত্ন করব। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাস পরেই সে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তাকে ভয় করছি দেখলে সে আনন্দ পেত। সে বলত, 'তোমাকে জ্বালাতন করতে বেশ লাগে আমার।' ভয়ে ভয়ে দিন কাটত আমার। এ-রকম প্রায় এক বছর সহ্য করলাম। বাপের বাড়ি কিছুতেই আমাকে যেতে দিত না। দিন দিন হাজার মন ভেঙে গেলেও, হাজার অত্যাচার সত্ত্বেও আমি তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বৃথা। একদিন যে-কামিজটা সে পরবে ব'লে ঠিক করেছিল সেটা কেচে রাখিনি ব'লে আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে সে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা কয়েক পরে নতুন জামা-কাপড় পরে, গলায় লাল চক্‌চকে রুমাল বেঁধে সে ফিরে এল। কি যেন একটা কাজ করছিলাম, তার আসার সময় ফিরে তাকাইনি। ডেকে বললে, 'এই মুখ্যু, শোন্, এদিকে আয়। পোশাকে আমায় কেমন মানিয়েছে বল্ দেখি।' উত্তর না দিয়ে নিজের ছেঁড়া, ময়লা কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কথা বেরুচ্ছে না কেন? হিংসে হচ্ছে বুঝি?' তবু আমি চুপ ক'রে থাকতে সে এগিয়ে এসে আমার গালে দুই চড় মেরে এমন ক'রে হাত মুচড়ে দিল যে যন্ত্রণায় আমি কাৎরে উঠলাম। বললাম, 'ছেড়ে দাও বলছি, নইলে আমার হাতেই একদিন মরণ আছে তোমার। নিজে ভরপেট গিলে আমাকে উপোস করিয়ে রাখবেন আর আমি ওঁর পোশাকের তারিফ করব—'কথা শেষ হবার আগেই যাচ্ছেতাই

গালাগালি করতে করতে সে একটা লাঠি নিয়ে আমায় এলো-পাথাড়ি মারতে আরম্ভ করল। জ্ঞান যখন আমার লুপ্তপ্রায় তখন সে আমাকে ঠেলে ফেলে দিল, বলল 'এই বার মার আমাকে, মার না।' তারপরে সে নির্বিবাদে শুয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। ব্যথায় সারা গা আড়ষ্ট, নড়তে পারি না। শুয়েই রইলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল এক কোণে স্বামী ঘুমিয়ে রয়েছে। নতুন পোশাক সে খুলে ফেলেছে, কিন্তু নতুন রেশমী রুমালটা গলায় তখনও বাঁধা। দেখতে দেখতে ঘৃণায় আমার মন ভরে উঠল। হঠাৎ কেমন মনে হল, ওকে মেরে ফেলে চির-দিনের মতো নিশ্চিন্ত হই না কেন! কিন্তু মারি কেমন ক'রে! চারদিকে তাকিয়ে হাতের কাছে কিছুই পেলাম না। দৃষ্টি পড়ল সেই চকচকে লাল রুমালটার উপর। কী যে হল জানি না—আমি চকিতে উঠে রুমালটা কষে তার গলায় বাঁধতে আরম্ভ করলাম। প্রথম চাপেই সে জেগে উঠল, চীৎকার ক'রে নিজেকে মুক্ত করবার প্রবল চেষ্টা করল। আমি আরও কষে বাঁধতে লাগলাম। তার চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপরেই শিথিল হয়ে এল তার দেহ। তাকে ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে কি রকম যেন হয়ে গেলাম। একটু একটু ভয়ও করছিল, এই বুঝি উঠে আবার আমাকে মারে। কিন্তু আর নড়ল না সে—তার পাশে আমিও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম। পর দিন সকালে এই অবস্থাতেই কেউ আমাদের আবিষ্কার করে, ও মরে আছে বুঝতে পেরে তখন পুলিশে গিয়ে খবর দেয়, ছুটোছুটি ক'রে সমস্ত পাড়ায় জানিয়ে দেয়। আমি তখনও যেন কেমন হয়ে ছিলাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আমার স্বামীকে আমিই খুন করেছি।

"পুলিশ না আসা পর্যন্ত কেউ এল না আমার কাছে। পুলিশের সঙ্গে ফাঁড়িতে গেলাম। বিচারের পর এলাম এইখানে। বয়েস কম ব'লে ফাঁসি হল না; আর মেয়েদের সাধারণতঃ ফাঁসির হুকুম হয় না। তাই সারাজীবন কাটবে আমার এই জেলে।"

বাচুলির মুখের উপর চোখ রেখে নীরবে শুনে গেলাম এই অদ্ভুত গল্প। যা বলছে বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। তবু জেলে যখন সে রয়েছে তখন মিথ্যেই বা হবে কি করে?

যেন একটা গল্প শেষ করেছে এইভাবে আবার সে কাজ শুরু করল। তার গল্পে আমার মনের কী প্রতিক্রিয়া জানবার একটু কৌতূহলও তার দেখলাম না। সরল মনে সে ঘটনাটাকে দৈবের কাজ ব'লেই ধ'রে নিয়েছে। এই তার কপালে ছিল · তাই নির্বিবাদে সে কারাজীবন মেনে নিয়েছে। যা থামানো যাবে না তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার?

তার নত মাথাটার দিকে তাকিয়ে মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। এই ছেলেমানুষ, জীবন সম্বন্ধে এর অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, এ খুনী হল কি ক'রে? ভাগ্যের একি রূঢ় ব্যবহার? কি ক'রে কাটবে এর জীবন? মনে হল, এরকম অপরাধের বিচার হওয়া উচিত অন্যভাবে, অন্যরকম শাস্তি। যাবজ্জীবন কারাবাস—হাসির কথা নয়। বেশি না হলেও অন্ততঃ কুড়ি বছর তো এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কাটাতে হবে! বহির্বিশ্বের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। চারদিকে শুধু অপরাধীর দল। সব সময় কানে আসছে কদর্যতম ভাষা; মিশতে হচ্ছে হীনতম লোকদের সঙ্গে। এমন সব কুবুদ্ধি শিখছে এখানে, যা বাইরে বারো বছরেও শেখা যায় না। বাচুলির বয়েস এখন পনের বছর। জেল থেকে যখন বেরুবে তার বয়েস হবে পঁয়ত্রিশ। সারা যৌবন এখানে কাটিয়ে

আর কি সে এই রকম নির্মল, নির্দোষ থাকবে ? হয়তো সে পাপে অভ্যস্ত হবে, আপনজন তাকে একঘরে করবে। পঙ্কিল জীবন যাপন ক'রে আবার হয়তো তাকে ফিরে আসতে হবে এই জেলে।

ভেবে কিছু ফল হল না। তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে, বাচুলি। ভালো হয়ে থাকো, জেল থেকে অনেক আগে ছাড়া পাবে।' উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, বলল, 'হ্যাঁ, ওরা আমাকে বলেছে, কোনো উপদ্রব যদি না করি আর ভালো ক'রে যদি খাটি আমাকে পুরো মেয়াদ থাকতে হবে না, অনেক আগেই ছাড়া পেয়ে যাব। বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাব আনন্দে। পাহাড়তলীতে দেশ আমাদের। এত ভালো লাগে আমার পাহাড় !' বিষণ্ণ-মনে ফিরে এলাম। মনে মনে প্রার্থনা জানালাম এই দীর্ঘ কারাবাসে ওর আশা আর সাহস যেন না ভেঙে পড়ে। পাহাড়ী মেয়ে বাচুলি, গাছপালা, ফুল, হাওয়ার মানুষ। সমতল ভূমিতে এই কারাবাস আর এই দারুণ গ্রীষ্ম কি ক'রে তার সইবে ! আমি মরছি এই সব ভাবনায় আর সে কিনা বেশ তার অদৃষ্টকে নির্বিকার চিত্তে মেনে নিয়েছে ! তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারলাম না।

আর একবার তাকিয়ে দেখি—সে ডুবে গিয়েছে কাজে। ছোট্ট বাচুলির সঙ্গে এক বছর কাটিয়েছি জেলে। বহির্বিশ্বের কামনায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠতাম ; কিন্তু মুক্তির প্রভাতে মন হল বিষণ্ণ। বাচুলির চক্‌চকে চোখ আর দেখতে পাব না, পাহাড়ী গান আর গল্প শুনে আর কাটবে না সময়। তাকে ছেড়ে যেতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। জেল ছেড়ে যাবার দিন সকলের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। কে যেন হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

ফিরে দেখি অশ্রু-সজল চোখ, চুপ ক'রে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাচুলি। তাকে আলিঙ্গন ক'রে মুখখানা তুলে ধ'রে বললাম, 'বুক বেঁধে কষ্ট সইতে হবে যে। ছাড়া পেলে আমাকে জানিও— ইচ্ছে হলে আমার কাছেই চলে এস কেমন?' বাচুলি বলল, 'বাইরে, অত মস্ত পৃথিবীতে গিয়ে, আমার কথা ভুলে যাবে না তো। ওরা বলে বাইরে একবার গেলে আর কেউ নাকি কয়েদী-দের মনে রাখতে চায় না।' তাকে আদর ক'রে বললাম, 'না, না, তা কখনও হয়রে পাগলি!'···বহুদিন কেটে গিয়েছে; এখনও তার কথা আমার মনে আছে, থাকবেও।

আমার কয়েকজন সঙ্গীও মুক্তি পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে অঙ্গন পার হয়ে, ফটক দিয়ে বেরিয়ে যখন আসি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম: বাচুলি আর তার মতো যত অল্প বয়সের মানুষ—তাদের যেন এইভাবে জীবন না কাটে জেলে, সুপ্রসন্ন ভাগ্য একদিন অচিরে যেন এসে তাদের জীবনে এনে দেয় স্বগৃহে বাস, সুখ ও শান্তি।

শেষবারের মতো ফিরে তাকালাম সেই কঠিন, ভীষণরূপা কারাগারের দিকে। কত অল্পবয়সের মানুষ জীবনের প্রারম্ভেই রুদ্ধ হয়ে রয়েছে এখানে। আমিও তো এক বছর কাটিয়ে এলাম। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফটক—ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের বিদায় জানাতে তখনও মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মনে করেছিলাম আমার চোখের জল তাদের দেখতে দেব না। কিন্তু তা হল না। তারা হেসে বললে, 'কি গো, জেল ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি।' তারা তো জানত না কেন আমাদের চোখে জল। আমার বোন আর আমার মতো

তারা তো মেশেনি এই মেয়ে-কয়েদীদের সঙ্গে। আলাদা থাকতো তারা। কি ক'রে বুঝবে তারা আমাদের মনোভাব? জেল এমন একটা কিছু প্রমোদপুরী নয় যে ছেড়ে আসতে আমার চোখে জল আসবে। চোখের জল ফেলছিলাম ঐ অসহায় মেয়েকটার জন্যে। ভুল ক'রে, অজ্ঞানে অপরাধ করেছে যারা। নির্যাতনে, সমবেদনার অভাবে যে কাজ তারা করেছে, দারিদ্র্য, অবহেলা আর নিষ্ঠুরতাই তার জন্যে দায়ী. তা না-হলে এমন কাজ তারা কখনই করত না। এই স্নেহের কাঙাল, শিশুর মতো সরল ছোট ছোট মেয়েদের জন্যেই মনে আমার বেদনা, বাড়ি ফিরে যাবার অনিচ্ছা। আমার বাড়ি আমায় আড়ম্বরে সম্বর্ধনা ক'রে নেবে, সাদরে গ্রহণ ক'রে নেবে আমার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জন, আর এদের?—ভাবতেই পারি না কি হবে এদের।

৭

'ভোরের বেলার পাখির কাকলী
রাতের তারার ঝিক্‌মিক্
তোমার খুশির গয়না, খেলনা
তাই দিয়ে দেব গড়ে।
বনের সবুজ দিনগুলি, আর,
নীল দিন যত সাগরের,
তাই দিয়ে আমি বানাব প্রাসাদ
তোমার আমার তরে।'

—ষ্টিভেন্‌সন্

লক্ষ্ণৌতে আমরা মুক্তি পেলাম না। জেলের মেট্রন আমাদের এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

এক বছর পর বাড়ি ফিরে দেখি—বাড়ি খালি। কমলা অসুস্থ, মা তার সঙ্গে কলকাতায়। কেউ জানতই না যে আমরা ছাড়া পেয়েছি। আনন্দ-ভবন তালাবন্ধ। কিন্তু খবরের বিদ্যুৎ-গতি। পথে কে আমাদের দেখতে পেয়ে রটিয়ে দিল আমাদের আসার কথা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবে বাড়ি ভ'রে গেল। সকলেই জেলের খবর শুনবার জন্য ব্যস্ত। জেলে শান্ত জনহীন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে আজ একসঙ্গে হঠাৎ এত লোক দেখে আমার কেমন ধাঁধা লেগে গেল।

দিন কয়েক এলাহাবাদে কাটিয়ে স্বরূপ আর আমি কলকাতা চ'লে এলাম। কমলা প্রায় সেরে উঠেছে। বাড়ি ফিরে আসতে চায়। সপ্তাহখানেক পর সকলে মিলে এলাহাবাদ ফিরে এলাম।

জেলে যাবার ঠিক কিছুদিন আগেই স্বরূপ তার তিন বাচ্চা মেয়েকে পুনার এক বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিয়েছিল। সবচেয়ে ছোটটি তিন বছরের কচি। সবাইকে দেখবার জন্যে স্বরূপ উদ্‌গ্রীব। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের বন্ধু। ইন্দিরাও সেখানে বোর্ডিং-এ থাকে। জেলে থাকার সময় কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম। শরীর বেশ ভেঙে পড়েছিল। মা বললেন, 'একটু বায়ু পরিবর্তনে তোর উপকারই হবে। স্বরূপের সঙ্গে যা না তুই কিছুদিন বম্বে-পুনা ঘুরে আয়।' খুশি হয়ে উঠলাম মায়ের কথায়। পুনায় যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। অনুমতি পেলেই তাঁর কাছে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে বড় আনন্দ পেতাম। আমাদের দেখলেই তিনি পরম স্নেহে কাছে ডেকে নিতেন।

স্বরূপ, তার ছেলেমেয়ে আর আমি সপ্তাহ খানেক বম্বে থেকে গেলাম। এই সময়েই প্রথম দেখা রাজার সঙ্গে। এক পার্টিতে গিয়েছিলাম—ঢুকেই চোখ পড়ল রাজার উপর। সকলের মধ্যে সেও একজন, তবু কেমন যেন একটু আলাদা, একটু স্বতন্ত্র। সবার চেয়ে সে যেন একটু উঁচু স্তরের। দেখে একটু বিরক্তি আবার একটু কৌতূহলও হল। পার্টিতে থেকেও সে যেন নেই। চুপ ক'রে ব'সে মীরশম্ পাইপ টানছে। কারো সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় তার হাতের গড়ন আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে থাকি। আমার মনে হয় হাতের গড়ন থেকে মানুষের চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। রাজার হাতও লক্ষ্য করলাম। সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীসুলভ হাত, হাতের মালিক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ভদ্রলোক বেশ স্থির-গম্ভীর। আবার আমাদের দেখা হয় জুহুতে এক চড়িভাতি উপলক্ষে। চড়িভাতির

আয়োজন করেছিলেন রাজা এবং আর একজন বন্ধু। রাজার সঙ্গে এবার অনেক কথা হল, বেশির ভাগই বই আর কমিউনিজম্ নিয়ে। আমি বললাম, 'জওহরের লাইব্রেরি থেকে কয়েকখানা বই দেব এখন আপনাকে পড়তে।' এইভাবে শুরু হল বন্ধুত্বের।

মে মাসে মুসৌরী গিয়ে স্বরূপের সঙ্গে মাস দুই থেকে ঠিক করলাম ফিরবার পথে অগস্ট মাসে আমেদাবাদে আমার বন্ধু ভারতী সারাভাই-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসব। সে শিগগিরই অকস্‌ফোর্ড যাচ্ছে। রাজাকে চিঠি লিখলাম, 'আশা করি আমেদাবাদ কি বম্বেতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' জবাব এল, 'দিল্লী হ'য়ে না গিয়ে বম্বে হয়ে যাবেন।' তাই ঠিক হল।

তখন থেকে বেশ কিছু আমার সময় কেটেছে রাজার সঙ্গে। সিনেমায় গিয়েছি, বহুদূর বেড়াতে গিয়েছি মোটরে। রাজা কিন্তু সব সময়েই কেমন একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলত। যদিও জানতাম, আমার সঙ্গে এত সময় যখন কাটাচ্ছে তখন আমাকে ওর ভালো লেগেছে নিশ্চয়, তবুও মনোভাবের কোনো প্রকাশ না পেয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হত তার আকর্ষণের ওপর। আবার—তার এই চাপা প্রকৃতিই তাকে ভালো লাগবার আর একটি কারণ।

আমি চিরকাল বেশ খানিকটা আদর-যত্নে মানুষ, সকলের সস্নেহ-দৃষ্টির আওতায় বড় হয়েছি। সমাদর ছাড়া কারো কাছ থেকে আর কিছু প্রত্যাশা করিনে। তার মানে নয় যে সকলের আমাকে সমাদর করা কর্তব্য, আমার মনে হয় আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা কারো কাছে অপছন্দের কারণ হতে পারে। তাই হয়তো রাজার উদাসীনতায় আমি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, তাই তার চারদিকের গ'ড়ে তোলা আবরণ ভেঙে দেবার জেদ চেপে

গিয়েছিল মাথায়। দিনের অনেকটা সময় কাটতো একসঙ্গে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা অফুরন্ত কথা ব'লে যেতাম ; কিন্তু কখনো কারো মনে বিরক্তি আসত না।

আমেদাবাদ যাবো, একদিন সন্ধ্যাবেলা কথায় কথায় রাজা হঠাৎ জিগগেস ক'রে বসল, 'শোনো : কবে আমাদের বিয়ে হচ্ছে বলতো ?' সোজা সরল হৃদয়ে স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন।

বিয়ের প্রস্তাবের এই অদ্ভুত ধরন দেখে ভারি মজা লাগল, আবার অবাকও হলাম। এই এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের রোজ দেখাশোনা হচ্ছে ; এর মধ্যে প্রেমের কথা একটি মাত্রও হয়নি। বুঝেছিলাম রাজার আমাকে ভালো লাগে ; কিন্তু বুঝতে পারিনি সে আমাকে ভালোবাসে। আমার দিক থেকে আমি তাকে যতই দেখছি, ততই তাকে আমার ভালো লাগছে। আমি যাদের জানি তাদের চেয়ে রাজা একেবারে ভিন্ন ধরনের। তবু ঠিক ক'রে উঠতে পারলাম না তাকে সত্যি ভালোবাসি কিনা। রাজাকে জানালাম সে-কথা।

তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত-কণ্ঠে রাজা আমাকে বুঝিয়ে দিল, যে না-বুঝতে পারলেও তাকেই আমি সত্যি ভালোবাসি, এখন দয়া করে শুধু কী বলবো—'হ্যাঁ ?'

বললাম, 'এখন নয় ; আমেদাবাদের ফিরতি পথে তোমায় জানান্ দিয়ে যাব।'

যে-কটা দিন ছিলাম না রাজা আমাকে রোজ চিঠি লিখত। সুন্দর চিঠি—আগ্রহের আতিশয্যে ভরা। দূরে গিয়ে বুঝলাম তার প্রতি কতখানি আমার অনুরাগ, তার সাহচর্য কতখানি আমার কাছে আগ্রহের বস্তু। আমেদাবাদে আর টিকতে পারলাম না ; ফিরে এলাম বম্বে।

এসেই বললাম, 'তুমি যা বলেছো তাই হবে।' এ ক'দিন সময়

কাটছিল স্বপ্ন-রাজ্যে। একদিন সকালে কাগজে দেখলাম রূঢ় সংবাদ—মায়ের খুব অসুখ। রাজাকে টেলিফোনে জানালাম, আজ রাতেই আমি এলাহাবাদ যাচ্ছি। ব্যথায় বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে। জানিনা—কবে, কখন—আবার দেখা হবে!

এলাহাবাদে এসে দেখি চিকিৎসার জন্যে মাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চললাম লক্ষ্ণৌ।

বাড়ি ফিরে শুধু স্বরূপকে বলেছিলাম রাজার কথা আর আমার তাকে বিয়ে করার কথা-দেওয়ার কথা। তখন মায়ের অসুখ, জওহর জেলে। তাই বিষয়টা আমাদের মধ্যেই রইল গোপন।

মায়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জওহর বিনা সর্তে মুক্তি পেল। বহু বিনিদ্র রাত্রি আর পরম উৎকণ্ঠার পর মা ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উঠলেন।

তখন একদিন সময় বুঝে আমি স্বরূপকে বললাম, 'দিদি এইবার জওহরকে বল না রাজার কথা।' কারও মত না নিয়ে আমার এই স্বয়ম্বরে বিস্মিত হবার কিছু নেই। ইচ্ছে মতন কাজ করবার স্বাধীনতা চিরকালই আমার ছিল। তাই ব'লে মা, ভাই, বোনের বিরুদ্ধে যাওয়া আমি কল্পনাও করতে পারি না। জানতাম, কোনো বিশেষ কারণ না থাকলে তাঁরা কখনও আপত্তি করবেন না। রাজার সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানতেন না। তবু মত যে তাঁরা দেবেনই এবং রাজাকেও যে তাঁদের ভালো লাগবে—জানতাম। আমার সুখই তো তাঁরা আগে দেখবেন। আমার শুধু ভয়, পাছে তাঁরা ভাবেন আমাদের পরস্পরের পরিচয়টা বিয়ের পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ যে নয় সে-কথা সত্যি। কিন্তু দীর্ঘ পরিচয়ে এমন বেশি কিছু যে একটা সুবিধা হয় আমার মনে হয় না।

জওহরের যেমন স্বভাব, চোখের আড় কোণে হেসে রাজার সম্বন্ধে

কথা পেড়ে বসল। 'কী সব কথা শুনছি, বিয়ে নাকি করতে চাও! ছেলেটির সম্বন্ধে কিছু খবর-টবর শুনতে এলুম।'

একটু বিব্রত বোধ করলেও বললাম, 'জিগগেস কর।'

জওহর—'কি করে ছেলেটি?'

আমি—'ব্যারিস্টার সে। এই মোটে প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করেছে।'

জওহর—'আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে কিছু জানো?'

আমি—'না।'

জওহর—'ক'টি ভাইবোন?'

আমি—'তা তো জানি না।'

জওহর চটবার উপক্রম করছে। আমি ভয়ে প্রায় কাঁপছি। কেন যে এই সাধারণ কথাগুলো রাজাকে জিগগেস করিনি? অক্সফোর্ডে কোন কলেজে সে পড়ত, কি করত সেখানে—এই রকম আরো অনেক প্রশ্ন জওহর করল। একটারও উত্তর দিতে পারলাম না। অবশেষে সে জিগগেস করল, 'নামের আগের অক্ষরদুটো দেখছি জি. পি। তুমি তো বলছ দেখছি রাজা-রাজা! মানে কি জি. পি'র?' রাজা আমাকে ব'লে দিয়েছিল কি মানে, কিন্তু এখন ভয়ের চোটে কিছুতেই মনে এল না। ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিছুতেই কিছু মনে আসছে না।' জওহর দস্তুরমতো ক্ষেপে উঠল, বলল, আশ্চর্য! তারপর দুমদুম ক'রে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর আমি মনের দুঃখে একা ঘরে বসে রইলাম।

বুঝলাম মহা মূর্খের মতো কাজ করেছি। কিন্তু রাজার সঙ্গে যে-ক'দিন ছিলাম, কেমন ক'রে জানিনা, এত মগ্ন হয়ে ছিলাম যে, তার সম্বন্ধে কি তার পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানার কথা আমার মনেই আসেনি। কতো কথা নিয়েই তো আলোচনা

করেছি, শুধু নিজেদের কথা ছাড়া। রাজাকে বড় ভালো লাগল, ব্যস্—আর কিছু জানবার যে প্রয়োজন আছে বোধ করিনি। সেই রাত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্যে রাজাকে লিখলাম। একটু বিরক্ত হয়েই যেন সে লিখে পাঠাল :

আমার পরিচয়

নাম—গুণোত্তম হাতিসিং

স্কুল—ন্যাশন্যাল স্কুল আর গুজরাট বিদ্যাপীঠ

কলেজ—অক্সফোর্ডে সেন্ট্ ক্যাথেরিনস্।

ইনস্ অব্ কোর্ট—লিঙ্কন্স্।

উপাধি—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, দর্শনে : বি. এ।

ক্লাব—যাই না ; কোথাও যেতেও চাই না।

পেশা—ব্যারিস্টর। যে কাজই করি উৎসাহ নিয়ে করি। ব্যারিস্টরিও তাই। তাই ব'লে কোনো কারণে যে ছেড়ে দিতে পারি না এমন নয়—যেমন দু'-এক বছরের মধ্যেই এ-পেশা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি রাজনীতির জন্যে।

শখ—পাইপ্ মুখে দিয়ে আরাম-কেদারায় আলসেমী করা। একটু চিন্তা করবার চেষ্টা করি—সাধারণ মানুষের যে-অভ্যেসটা বিশেষ নেই বললেই চলে।

খেলাধূলা—ক্রিকেট খেলতাম আগে। এখন আর খেলি না।

চরিত্র—অনেকের মতে দাম্ভিক এবং স্বার্থপর।

বিবাহ সম্বন্ধে মত—স্বাধীনতায় এবং স্বাধীনতা রক্ষার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আস্থাবান।

পরিচয়-সূত্র—কিছু নেই।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা—কিছু নেই।

আর্থিক সঙ্গতি—মন্দ নয়, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যায়। এমন কিছু প্রাচুর্য নেই।

মোট কথা—১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে উপরোক্ত ব্যক্তিকে বিবাহে কুমারী কৃষ্ণা নেহেরুর মতলাভের আশায় এই আবেদন—হয়তো ধৃষ্ট আবেদন—কে জানে!

ভারি মজা লাগল এই চিঠি পেয়ে; বুঝলাম এই বিশদ বিবরণ দিতে রাজা কিরকম বিরক্ত হয়েছে।

মা একটু ভালো হলে জওহর বম্বে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে এল; তারপর গান্ধীজীকে জানাল আমার অভিপ্রায়। রাজার পরিবারের সঙ্গে তিনি ভালো ক'রেই পরিচিত। বললেন, 'তাকে আমি অল্পস্বল্প চিনি। একবার দেখা করতে পারলে বেশ হতো।' রাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল এবং তাঁর জেরায় একটু ক্ষুব্ধও হল। তবু সে পেছপা হয়নি, দ্বিধাও করেনি। (নিশ্চয় বলতে পারি, সে-জেরার সম্মুখীন হবার সাহস খুব কম লোকেরই আছে)। লক্ষ্ণৌ এসে মায়ের এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হবার নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করল। দিন-পনেরো পরে রাজা এসে পৌঁছুল। মা তখনো হাসপাতালে, বিপদ তখনও কাটেনি। তাকে দেখেই মায়ের ভালো লেগে গেল। রাজারও খুব ভালো লাগল মাকে। কিছুদিন পরেই মা বললেন, 'যত শিগগির সম্ভব বিয়ের বন্দোবস্ত কর।' মা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত আমার বিয়েতে আপত্তি ছিল। মা কিন্তু কিছুতেই দেরি সইতে রাজী হলেন না। তাঁর ধারণা তিনি আর বেশিদিন নাও বাঁচতে পারেন। তেমন কিছু হবার আগেই তিনি আমার ঘর-সংসার দেখে যেতে চান।

১৯৩৩ সালের ২০শে অক্টোবর আনন্দ-ভবনে রাজার আর আমার 'সিভিল-ম্যারেজ' আইন অনুসারে বিয়ে হল। আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠান আধ ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ে স্বরূপের বিয়ের কথা—সেই সাত-আটদিন ধ'রে মহা সমারোহ। আমার বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, রাজার বোন, ভাইরা এবং কাকা কস্তুরভাই লালভাই। আমার মা তখনও শয্যাশায়ী আর আমেদাবাদে রাজার মাও অত্যন্ত অসুস্থ। তাই যথাসম্ভব নীরবে এই বিবাহ সম্পন্ন হল।

বাপু এলাহাবাদে আসতে পারলেন না, প্রস্তাব করলেন ওয়ার্ধায় আমাদের বিয়ে হোক। বাপুর আশীর্বাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকলেও এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। মৃত পিতার এবং শৈশবের স্মৃতিতে ভরা এই বাড়ি—এখানে ছাড়া আর কোথাও বিবাহে মন সরল না। আমার বিয়েতে এই একটিমাত্র ত্রুটি সেটা বাপুর অনুপস্থিতি। তিনি পাঠালেন আশীর্বাদ আর তাঁর নিজের হাতে বোনা সূতোয় তৈরি দুগাছি মালা—রাজাকে আর আমাকে উপহার। আশীর্বাদ-পত্রে লিখেছেন :

'কৃষ্ণা, বিবাহে তোমার পুনর্জন্ম। বিবাহ একরকম পুনর্জন্ম নয় কি? তোমার বোন স্বরূপ বিয়ের কনে হিসেবে কাথিয়াওয়াড় এল বটে; কিন্তু থাকবার সময় স্বামীকে নিয়ে বাস করল গিয়ে নিজের দেশে। কিন্তু তোমার আর স্বরূপের মধ্যে তফাৎ অনেক; মনে হয় না তুমি রাজাকে দেশছাড়া করবে। তাছাড়া রাজা গুজরাটি, সহজে তার নিজের দেশ ছাড়বে না। তাই আশা করি, হয় গুজরাট নয় বম্বেকেই তুমি তোমার নিজের দেশ ক'রে নেবে। আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই: তুমি সুখী হও, যেখানেই থাক

সেইখানেই তোমাদের দেশবরেণ্য পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি কর। যেতে পারলাম না ব'লে মনে দুঃখ রইল। তাই আশীর্বাদ পাঠিয়েই ক্ষান্ত হলাম। —'তোমার বাপু'

আমাদের বিয়ের কথা বল্লভভাই নাসিক জেলে থাকতে শুনেছিলেন। তিনিও চিঠিতে অভিনন্দন, আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনিও লিখেছিলেন যে যদিও আমার ভগ্নীপতি নিজের দেশ ছেড়ে আমাদের দেশ যুক্ত-প্রদেশে এসে বসবাস করছে, গুজরাটিরা কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেবে না, তাদের দেশেই রাখবে, রাজাকে নিয়ে আমাকে উত্তরমুখো হতে দেবে না। বল্লভভাই-এর আশঙ্কা অমূলক। আমার ওরকম কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তাই এ-কথা জেনে বরঞ্চ আনন্দই হল যে অনেকে আমাকে ওখানে অভ্যর্থনা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন।

আমাদের পরিবারের পুরনো বন্ধু সরোজিনী নাইডুও আমাকে অভিনন্দন জানালেন—যে অভিনন্দন একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আসতে পারে, কবিতায়, গানে ভরপুর। তিনি লিখেছিলেন,

'স্নেহের বেটি, (আমার এক ডাকনাম—মোটেও পছন্দ করি না), জাতীয় জীবনের এই শুষ্কতার মাঝে অজান্তে ফোটা, রূপে রসে ভরা এক প্রেমের ফুল আবিষ্কার ক'রে কার না মন আনন্দে ভরে ওঠে? কিন্তু কি দুষ্টু তোরা দুটিতে—এতদিন এই মনের কথাটা গোপনে রেখেছিলি। তোর এই নতুন-পাওয়া সুখে, জানিস ছোট্ট মেয়ে, আমি কত সুখী! সুখ আমার অনেকগুণ বেড়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে—রোগ-শয্যায় শুয়ে তোর মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হতে যাচ্ছে। তাঁর কন্যাকে আজ বধুবেশে দেখে—কত সান্ত্বনাই

না পাবেন মাম্মাজি (মিসেস নাইডু এই নামেই মাকে ডাকেন)। আর এও জানি—মনের আসল ভাব এক টুকরো হাসি বা এক দমক রসিকতায় গোপন রেখে তোমার এই নির্বাচনে সুখী হয়ে কত আশীর্বাদই না করতেন পাপাজী (বাবা)। এই ইচ্ছা তাঁরও মনে ছিল কিনা ; মাঝে মাঝে বলতেন আমাদের।

'তোমার চেয়ে তোমার রাজার সঙ্গে আমার দীর্ঘতর পরিচয়। দ্রুত তার বিভিন্ন কয়েকটা চিত্রেরও বর্ণনা দিয়ে যেতে পারি : অক্স-ফোর্ডে মে-সপ্তাহ—নদীর উপর নৌকোয় শুয়ে রাজা পুরোহিত এবং মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করছে ; লম্বা, ঝোলানো টাই—মুখে পাইপ, লণ্ডনে কাফে রয়ালের চারদিকে রাজা ঘোরাফেরা করছে—পুরোদস্তুর খেয়ালী ; শেষচিত্র দিচ্ছি যখন সে খদ্দর-পরা এক ভিড়ের পুরোভাগে খাপছাড়া, আত্ম-সচেতন ভাবে দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ স্টেশনে জওহরকে বিদায়-সম্বর্ধনার অংশগ্রহণ করছে ; সবারই মনে এক প্রশ্ন—এ লোকটা আবার কে ? আমিও একটু অবাক হলাম। প্লাটফর্মে আমার পাশ দিয়েই সে হেঁটে চলে গেল, তবু চোখের ক্ষীণতম আভাসেও ব'লে গেল না জওহরের সঙ্গে তার আসন্ন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা কি !

'স্বরূপ আর কমলা দেখছি খদ্দরের পরিমিত বৈচিত্র্য থেকে তোমার বধূবেশ কিনতে এসে এখানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে । কিন্তু বেশের জন্য তোমার এত চিন্তার কী প্রয়োজন ? তোমার তো পরনে সুখ আর স্বপ্নের সজ্জা, যৌবনের হীরে-মুক্তোই তো তোমার এখন জহরৎ অলঙ্কার !

'প্রার্থনা করি—শুধু অকৃত্রিম ভালোবাসায় নয়, মনের আন্তরিক আদান-প্রদানে, পরস্পরের প্রতি অটল বিশ্বাসে, এক স্বার্থে এবং

জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে তোমাদের বিবাহ সুন্দর স্থায়ী সখ্যে পরিণত হোক।

'তোমার বিয়েটা শুধু তোমার পরিবারের এবং তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। তোমার ভিতর অনেক কিছু তোমার পরিবারের ঐশ্বর্যময় মহত্বে মণ্ডিত হয়ে আছে। সে মহান ঐতিহ্য জাতির স্থায়ী কীর্তি এবং আদর্শের অন্তরের সামগ্রী, অনুপ্রেরণার উৎস। তাই এই বিবাহে জাতির অংশ রয়েছে; কারণ তুমি মতিলাল নেহেরুর কন্যা, স্নেহের জওহরের বোন।

'আমারও ছোট্ট বোন তুমি। তোমার আজ বধূবেশ। তাই আমার সমস্ত ভালোবাসা, আশীর্বাদ তোমাকে আজ পাঠিয়ে দিলাম। জীবনের সঙ্গী, বন্ধু, যৌবনের সাথী তুমি খুঁজে পেয়েছ, তোমাদের আনন্দে আমি অংশীদার।'

এই চিঠি এবং আরও এ-রকমের অসংখ্য চিঠিতে আমার প্রতি যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপিত হল, তা গভীরভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করলে। মনে আশা হল ভবিষ্যৎ-জীবন আমার সার্থক হবে।

বিয়ের কয়েকদিন পরেই নতুন বাড়িতে গেলাম পুরনো বাড়ি ছেড়ে। নানা আশঙ্কা হচ্ছিল মনে। রুগ্ন মা এবং বাড়ির অন্য সকলকে ছেড়ে মন কিছুতেই যেতে রাজী হচ্ছিল না। ভবিষ্যতে যে নতুন জীবন—তার ভয়ও কম নয়। কিন্তু রাজার দিকে তাকিয়ে সাহস পাই; তার অনুরাগ, তার প্রেম বলে—ভয় নেই।

আমেদাবাদ যাওয়ার দিন সন্ধ্যায়, যখন আত্মীয়-বন্ধু এবং শহরের অনেক জানাশোনা লোক আমাকে বিদায় দিতে এল তখন মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সবাই আলিঙ্গন করল সজল চোখে; আমি নিজেকে সামলে রইলাম। শেষে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল,

আমি তখন জওহরের আলিঙ্গনে। মৃদুস্বরে সে বলল আমার কানে কানে, 'সুখী হোস, বোন।' ব্যস্, ঐ তিনটি কথায় নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না, চোখের জল আর বাধা মানল না। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বুক ভেঙে গেলেও, তাঁর মুখ চেয়ে কাঁদিনি। ট্রেন ধীরগতিতে চলতে শুরু করল, মনে হল, লাফিয়ে পালাই আমার আপনজনদের কাছে। কিন্তু পাশায় তখন দান পড়েছে, ফিরবার আর পথ নেই।

আমেদাবাদ কাছাকাছি হতেই রাজা এই প্রথম আমাকে তার বাড়ির প্রত্যেক লোকের পরিচয় দিতে লাগল। পক্ষপাতহীন ছবি এঁকে দিল প্রত্যেকের, জানিয়ে দিল কি-রকম জীবন রয়েছে আমার সামনে। সম্ভাব্য অসুবিধাগুলিরও উল্লেখ করল। বললে, 'জানি, নিজের বাড়ি ছেড়ে আসতে তোমার কত কষ্ট হয়েছে। এ আমি চাইনি। আমার কি মনে হল জানো? মনে হল একটা সতেজ ফুলন্ত গাছকে যেন তার মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে আসছি।' এই গাছকে নতুন করে পুঁততে হবে অন্য মাটিতে। তাই মনে তার সন্দেহ। নতুন মাটি পেয়ে একি আরও ফলে ফুলে ভ'রে উঠবে; না অপরিচিত পারিপার্শ্বিকে ঝ'রে শুকিয়ে যাবে। বাড়ি যত কাছে আসে—রাজা ততই চিন্তিত হয়ে ওঠে। আমাকে বিয়ে করে খানিকটা অনুতপ্তই হয়ে ওঠে যেন!

ভোরে আমেদাবাদ পৌঁছুলাম। প্রচুর সম্বর্ধনা মিলল আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে। দিনকয়েক আমেদাবাদে থেকে চলে গেলাম বম্বে। আরম্ভ হল নতুন জীবন।

যৌবনে সরকারী স্কুল ছেড়ে দিয়ে রাজা জাতীয় বিদ্যাপিঠে যোগ দিয়েছিল। পরে ইংলণ্ডে অন্যান্য ছাত্রদের মতো মেতেছিল রাজনীতিতে। দেশে ফিরে ঠিক করল, বম্বে বার্-এ সুপ্রতিষ্ঠিত

না হয়ে আর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করবে না। কিছুদিন চলল এই রকম। কিন্তু অত্যধিক রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে বেশিদিন নীরব-দ্রষ্টা হয়ে থাকা কষ্টকর। ধীরে ধীরে রাজনীতিতেই সে নেমে এল। দেখতাম রাজা তার ব্যারিস্টারী ব্যবসা নিয়ে খুব সুখী নয়। নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যটুকু দেশের কাজে নিয়োগ করতে, প্রয়োজন হলে স্বাধীনতার জন্য তার সব কিছু সমর্পণ করতে সে কুণ্ঠিত নয়। আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থই তার রাজনৈতিক আদর্শ ক্ষুন্ন করতে পারেনি, কোনোদিন পারবেও না মনে হয়। সব সময়েই সে নীরব-কর্মী। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ করতে ভালোবাসে। রাজনীতির বহু মোহ ভেঙে গেলেও এতদিন সে তার সঙ্কল্পকে দৃঢ় রেখেই অকম্পিত পদে চলে এসেছে।

রাজা হচ্ছে সেই জাতের লোক, যাদের বয়েস হলেও তাদের আদর্শে ছেলেমানুষের মতো আস্থাশীল। সে সৎপ্রকৃতির দিল্‌দরিয়া মানুষ। সবার উপর মানুষ সত্য—এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। নিজেকে সে অত্যন্ত কঠিন মানদণ্ডে বিচার করে; তাই ব'লে অন্য আদর্শে বিশ্বাসীদের ঘৃণা করে না। এই রকম আদর্শবাদী যারা, তাদের ভুল ভাঙলে বড় ক্ষুণ্ণ হয়।

অনেক লোকের ধারণা সে উন্নাসিক, দাম্ভিক। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তার দোষ হল—যদি সেটাকে দোষ বলা যায়—তার স্পর্শকাতরতা। জীবনের আরম্ভ থেকেই সে চাপা লোক। সাধারণের থেকে তার মনোভাব ভিন্ন ব'লে লোকে তাকে বড় ভুল বোঝে। তার এই চাপা স্বভাবকেই লোকে অহমিকা ব'লে ভুল করে। যারা তাকে জানে তারা তার গুণাবলীর প্রতি অনুরক্ত নয়, যদিও বহু গুণের অধিকারী সে; তারা ভালোবাসে তার মধ্যে দোষ আর দুর্বলতা মেশানো মানুষটিকে।

৮

'আমরা পথিক, আমরাই পথ যা বেয়ে চলি ;
বাসা বাঁধি, তবে পালকের মতো, কালের স্রোতে।'
—সেসিল ডে লুইস

১৯২০ সাল থেকে জীবন এত পরিবর্তনশীল আর অনিশ্চয়তা-মুখর হয়ে উঠেছে যে, বুঝতেই পারতাম না কিসের পরে কি ঘটবে। প্রথম প্রথম এই অবিরাম অনিশ্চয়তা ভালোই লাগত। কিন্তু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, অনিশ্চয়তার এই একটানা চলা মাঝে মাঝে বড় বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। এর তুলনায় আমার প্রথম বিবাহিত জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। মাঝে মাঝে এক-একটা আলোড়ন এলেও, ভেবেছিলাম এই রকমই চলবে। কিন্তু তা কখনও চলে !

প্রথম কয়েক মাস জীবন একটু দুরূহ ঠেকল। আমেদাবাদ মস্ত বড় শিল্পকেন্দ্র। শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ এর প্রাচীন জীবনে জেগে বহু স্বতোবিরোধী জিনিসের সৃষ্টি করেছে। এ-রকম একটা জীবনধারা যে প্রবাহিত হয় তা আমার জানাই ছিল না। এখানকার সব কিছুই আমার পরিচিত জগত থেকে ভিন্ন—জীবনবেদ, আচার-ব্যবহার, জীবনধারণের পদ্ধতি—সব কিছু। সদয় ব্যবহার এখানে সকলের কাছ থেকেই পেতাম। তবু মাঝে মাঝে বড় একা লাগত, কি করব ভেবে পেতাম না। রাজাকে এত ভালো না বাসলে এ-জীবন আমার পক্ষে সত্যিই দুর্বহ হয়ে উঠত। হতাশার প্রতি মুহূর্তে তার সমবেদনা, তার ভালোবাসা আর তার পরিবারের সস্নেহ বিবেচনা আমাকে বাঁচিয়ে এসেছে।

এখনও অনেক ব্যাপারে আমি হয়তো রাজাকে অনেক সময়ে সাহায্য করতে পারি না ; রাজার সাহায্য থেকে আমি কিন্তু কোনোদিন বঞ্চিত হইনি।

কয়েক মাস পরে জওহরের একটা চিঠি আমার এই নতুন জীবনের সঙ্গে মিশে যাবার প্রচেষ্টায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। সে লিখেছিল, 'তোমার যে বিবাহিত জীবন তা দেখতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, তাতেই হবে তোমার জ্ঞান-সঞ্চয়। কিন্তু সে জ্ঞান আসে বহু দিনের বহু তুঃখের পর ; তুঃখের বিষয় সে-দিনগুলো আর ফিরে আসে না। যাদের জেল ভোগ করবার সুযোগ মিলেছে তারা জানে ধৈর্যের কত দাম। এখানেই তারা শেখে নিজেকে কেমন করে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সেটা বড় কম জিনিস নয়। কৃষ্ণা, আশা করি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে শিগগিরই তোমার মনের সহযোগিতা মিলবে ; চিরকাল সুখী হবে।'

বিয়ের পরে প্রথম ক'মাস সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছিল খাবার। খাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা কোনোদিনই ছিল না। সব কাশ্মীরীদের মতো মাছ মাংস আমারও প্রিয়। আমেদাবাদে সবাই কঠোর নিরামিষাশী। মাছ, মাংস, ডিম—সবই অচল। হোটেল, রেস্তোরায় যাওয়ার উপায় নেই—ওসবের চলনই নেই এখানে। গুজরাটি খাবার মন্দ লাগত না কিন্তু শুধু শাকসব্জীতে মন উঠত না। তিন মাস নিরামিষ খাবার পর মনে হল যেন এতদিন উপবাসেই কাটিয়েছি। পরে মাংসের উপর অত নির্ভর না করতে অভ্যেস করেছি, এখন আমি স্বেচ্ছায় বহুদিন মাংস না খেয়ে থাকতে পারি।

আমেদাবাদে রাজাদের পরিবার বিখ্যাত ব্যবসায়ী-পরিবার।

রাজারা যখন খুব ছোট তখন তাদের বাবা মারা যান। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তার মা-ই তখন সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা দেখা-শোনা করতে শুরু করেন। ছেলেরা বড় হলে তাদের হাতে তুলে দেন সেই ভার। প্রায় সব ব্যবসায়ীদেয় মতো রাজাদের পরিবারও অত্যন্ত সংযতবাক, ধীর। সব কিছু থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করে। নিজেদের আবেগ অপরের কাছে বড় একটা প্রকাশ করতে চায় না। তাদের এ বিশেষত্বটা প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি। এই সংযমকে মনে করেছিলাম ঔদাসীন্য।

রাজাদের পরিবার একান্নবর্তী হলেও বাড়ির লোকেরা এ ওর জীবনধারায় হস্তক্ষেপ করে না। তাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শুধু ব্যবসাগত নয়। আমেদাবাদের ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বড় সংকীর্ণ সংরক্ষণশীল, আত্মকেন্দ্রিক। একান্নবর্তী পরিবারে কোনোরকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অচল। ফলে কারো কারো ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রভাব বড় বিরক্তিকর, বড় অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়। তাই মিশ খাইয়ে নিতে অনেক সময় লাগে।

অতীতের সমাজব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবারের প্রয়োজন ছিল স্বীকার করি। কিন্তু সে সমাজব্যবস্থা আজ ভেঙে যাচ্ছে। পুরনো রূপ নিয়ে বাঁচা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাই সারা ভারতে শুরু হয়েছে এক সামাজিক ভাঙন। কারো নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধা-ধরা নিয়মের বিরোধ। ক্রমে ক্রমে তাই প্রতি পরিবারের জোর কমে আসছে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নয়, জাতির জীবনেও এ-ভাঙনের ঢেউ এসে লেগেছে। জগতের নতুন ধারার সঙ্গে এই পরিবার আর তাল রেখে চলতে পারছে না। আমার মনে হয় একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হয়ে যাবে। তবে ভারতবর্ষ মস্ত দেশ—তার ঐতিহ্য গভীর!

তাই কিছু সময় লাগবে। ছোট একান্নবর্তী পরিবারের কথা অবশ্য আলাদা এই যেমন আমরা ছিলাম আনন্দ-ভবনে। কোনো বাঁধাধরা নিয়মে আমাদের কারো জীবন বাঁধা ছিল না। একসঙ্গে থেকে যে যার মতো জীবন যাপন করতাম—কারো সঙ্গে কারো কখনো বিরোধ লাগত না। স্নেহের বাঁধন শুধু ছিল, আর কোনো বাঁধন না। একান্নবর্তী পরিবারের অর্থনৈতিক বাঁধন ক্রমে এমনই সত্যিকারের হয়ে দাঁড়ায় যে কারো বেড়ে-ওঠার পথে তা হয়ে উঠে বিশেষ অন্তরায়।

রাজার পরিবারের সঙ্গে, এমন কি রাজার সঙ্গেও আমার মনের গরমিল হতো মাঝে মাঝে। অনেক বিষয়েই তার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। সেই বিরোধের সময় দেখেছি রাজার ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা—অপরিসীম অসাধারণ। তার এই গুণের জন্য প্রথম ক'মাস কাটানো আমার সহজ হয়েছিল।

বিয়ের পর কয়েকমাস আমরা রাজার পরিবারেই রইলাম। তারপর আমরা এক ফ্ল্যাটে চলে আসি। ছোট্ট ফ্ল্যাট, বেশ আধুনিক ; খুব ভালো লাগল আমার। ঘরকন্না করতে কোনোদিন শিখিনি—মাঝে মাঝে মহা মুশকিল হত। মোটের উপর ভারি মজা লাগত গেরস্থালী করতে। মস্ত বাড়ি আর প্রাচুর্যের মধ্যে থাকার পর ছোট্ট ফ্ল্যাটে সরল জীবনযাত্রাব মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে।

রাজা কাজে ব্যস্ত থাকত ; আমার লাগত একা-একা। বম্বেতে আমার জানাশোনা লোক অল্প। রাজার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই বাবার বন্ধু-পরিবার। বন্ধু যোগাড় করা আমার একটা স্বভাব। তাই দেখতে দেখতে বহু বন্ধু জুটে গেল। মহা সুখে কাটতে লাগল জীবন।

প্রতি বছরের ভালো সময়টাতেই জওহর যেমন জেলে থাকে

এবারেও তেমনি ১৯৩৪ সালের শীতকালে সে গেল জেলে। অনেক দিন দেখা হয়নি আমাদের। তাই কমলা যখন লিখল আমি আর রাজা তার সঙ্গে দেখা করতে চাই কিনা, আমরা সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলাম। ঠিক হল কমলাকে নিয়ে একসঙ্গে দেরাদুন জেলে যাব দেখা করতে। নির্দিষ্ট দিনে জেল ফটকে পৌঁছে আধঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পর জওহরের 'সেল্-'এ যাবার হুকুম পেলাম। সাধারণতঃ জেলের আপিসেই সাক্ষাতের নিয়ম। কিন্তু জওহরের 'সেল' ছিল বাইরের দিকে তাই আমাদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি মিলল। রাজা এর আগে কখনো জেলের ছায়াতেও আসেনি! এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা। অন্যান্য কারাগারের তুলনায় দেরাদুন জেল অত বীভৎস-দর্শন না হলেও যে কখনো আমাদের দেশের জেল দেখেনি তার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। জওহরের ঘরে গেলাম— শূন্যপ্রায় ঘর, একখানা লোহার খাট, একখানা টেবিল আর একখানা চেয়ার। এদিকে ওদিকে কয়েকখানা বই ছড়ানো, এক কোণে একটা চরকা। থম্‌থমে দিনটা, খর বাতাস বইছে। অত্যন্ত শীত। নিরানন্দ 'সেল'। জওহর তার সেই অভ্যস্ত হাসি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেও তাকে রোগা, অসুস্থ দেখাচ্ছিল। কমলা আর আমি এই রকম সাক্ষাৎকারে অভ্যস্ত—প্রিয়জনদের নানা রকম অবস্থায় চিরকাল দেখে এসেছি। রাজার কাছে এ-সব নতুন। এই দৃশ্যে সে একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সারাক্ষণ সে চুপ ক'রেই ব'সে রইল, যত কথা বললাম আমরা দু'জন। বাড়ি ফিরে কারোও সঙ্গে কোনো কথা না ব'লে সে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ পরেও সে ফিরে না আসায় দেখতে গেলাম কি হয়েছে। গিয়ে দেখি সে বিছানায়—মনের অবস্থা যে

খুব খারাপ তা দেখামাত্রই বোঝা গেল। তারপর থেকে রাজা অনেকবারই জেলে জওহরের সঙ্গে দেখা করেছে এবং প্রত্যেকবারই দেখতাম বেশ একটু মুষড়ে পড়েছে। বছরের পর বছর প্রিয়জনদের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তবু মন ভেঙে যায় না; সংগ্রাম চালাবার দৃঢ়-সংকল্প আরও বেড়ে যায়। আজ অনেকের সঙ্গে রাজা নিজেও জেলে—প্রায় এক বছরের ওপর আমরা পরস্পরকে দেখিনি। যখন আমার চিঠিতে একাকিত্ব এবং তার সঙ্গলাভের আকাঙ্খা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, রাজা অনুযোগ করে আর আমি আমার দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত হয়ে উঠি।

রাজা বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না ক'রে ছিল কিন্তু অবস্থা ক্রমশ এমন হয়ে উঠল যে আর দূরে থাকা চলল না। রাজা নেমে পড়ল। অনেকের ধারণা আমার প্রভাবেই সে ব্যবসা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে। সে-ধারণা ভুল। রাজনীতি মানে যে কি তা আমি খুব ভালো করেই জানি — অনিশ্চয়তা, এলোমেলো পরিবর্তন, কারাবাস, দীর্ঘ বিচ্ছেদ। তেরো বছর আমি ঐ সবের মধ্যে কাটিয়েছি। তাই আমার সদ্যপ্রাপ্ত এই সুখ আর শান্তি তাড়াতাড়ি হারাতে আমি রাজী ছিলাম না। আমি নিজে রাজনীতিতে স্পষ্ট অংশ গ্রহণ করতে চাই না। আমার ছেলেরা কচি। দেখেছি জওহর আর স্বরূপের ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত—এটা আমার ভালো লাগত না। তবুও রাজনীতির ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে একেবারে বাঁচিয়ে চলা সম্ভব নয়। তাই যেটুকু পারতাম দেশের কাজ করতাম। রাজা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করতে চাইতো। তাকে আমি বাধা দেব

কেন? কিছুদিনের সুখশান্তির পরেই আবার নিজেকে তৈরি করতে হল সেই পরিচিত ধরপাকড়, বিচ্ছেদ আর কারাবাসের জন্যে।

মস্ত বড় শহর বম্বে; বেশ লাগে আমার এখানে। এলাহাবাদ ভালো লাগত—এলাহাবাদ আমার দেশ ব'লে। বড় শহর আমার ভালো লাগে, অর্ধেক জীবন ছোট শহরে কাটিয়েছি ব'লে বোধ হয়। বম্বে ভালো লাগে এর জীবনধারার উষ্ণতার জন্যে, এর বন্ধুত্বের পরিবেশের জন্যে। কৌতুহল জাগায় এই শহর। সমুদ্র আমার কাছে নতুন, মুগ্ধ ক'রে ফেলল আমাকে। ইউরোপ যেতে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বটে; তবে সমুদ্রের এত সান্নিধ্যে কোনোদিন থাকিনি। বম্বেতে চোখ ভ'রে দেখতাম তার ঢেউ, তার খেলা, পাহাড়ের গায়ে তার ধাক্কা খাওয়ার মাতামাতি।

দিন আমার কাটতো মন্থর গতিতে। সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নারী-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম। ভালো লাগত বস্তি অঞ্চলে কাজ করতে। কিন্তু এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য সেখানে—দুঃখ হতো ক্ষমতা নেই মোচন করবার।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে মা এলেন দেখা করতে। জওহর জেলে; কমলা কলকাতায় চিকিৎসাধীনে। এলাহাবাদে তিনি একেবারে একা। তাই বাপুর অনুরোধে অল্প কয়েক দিনের জন্যে ওয়ার্ধা যাওয়া মনস্থ করলেন। ওয়ার্ধা হয়ে এলেন বম্বে। আমার নতুন বাড়িতে তাঁর এই প্রথম পদার্পণ। মন আমার খুশিতে ভ'রে উঠল। তাঁর থাকার কথা একমাস কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সপ্তাহ তিনেক পরেই পক্ষাঘাতে শয্যাগত হয়ে রইলেন প্রায় দু'মাস। স্বরূপ আর মাসীমা বম্বে চলে এলেন।

মা জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আর আমরা নিরুপায় উদ্বেগে দিন রাত্রি তাঁর পাশে ব'সে।

মা যখন সেরে উঠছেন সেই সময় ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার বড় ছেলে হর্ষ জন্মায়। মায়ের আনন্দ আর ধরে না। এই তাঁর প্রথম পৌত্র। কারণ জওহর আর স্বরূপের সবই মেয়ে। মা আরোগ্যলাভ করলেন বটে কিন্তু এই হল তাঁর শেষ পর্বের শুরু। পুরনো স্বাস্থ্য তিনি আর ফিরে পেলেন না।

কিছুদিন থেকেই কমলা অসুস্থ। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে তার অবস্থা আরও খারাপ হলো। একটু ভালো হলেই ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন সুইজারল্যাণ্ডে যেতে। সে-সময় কমলা থাকতো যুক্তপ্রদেশের ক্ষুদ্র শৈলাবাস ভাওয়ালির স্বাস্থ্য-নিবাসে। রাজা আর আমি ঠিক করলাম কমলা ইউরোপ রওয়ানা হবার আগে কিছুদিন ওর কাছে গিয়ে থাকব। কোলের দু'মাসের ছেলে নিয়ে যাত্রা করলাম ভাওয়ালি। এক মাস রইলাম তার সঙ্গে। তার পর সে চলে গেল। তখন বুঝিনি এই তার সঙ্গে শেষ দেখা।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কমলা মারা গেল।

তার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার চারদিন পরেই আমার ছেলে অজিতের জন্ম। তার জন্ম উপলক্ষ্যে উৎসবের উপর পড়ল কমলার মৃত্যুর ছায়া। বিষাদাতুর হৃদয় স্বীকার করলে না এ-আনন্দ। তবু এই নতুন শিশুর আগমনে এই আঘাতের দুঃখ কোনোরকমে সইতে পেরেছিলাম মনে পড়ে।

৯

সবার চেয়ে মধুর যাহা
সবার আগে ঝরে,
সুবাসটুকু শুধুই শেষে জাগে ;
গোলাপ ভালোবেসেছে যেবা
তাহার কাছে তবু
গন্ধ তার বিষে মতো লাগে।

—ফ্রান্সিস্ টমসন্

আনন্দ-ভবনে বাবা এক পার্টি দিচ্ছিলেন। সেই সময় কমলাকে প্রথম দেখি। আমি তখন খুব ছোট ; পার্টিতে যোগ দেওয়া নিষেধ। তাই বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম। আমার এক মাসিমা আঙুল দিয়ে কমলাকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে মেয়েটি দেখছ—কেমন লাগে তাকে ? ভালো তো ? ও-ই তোমার বৌদি হতে যাচ্ছে।' আঙুলের অনুসরণে তাকিয়ে দেখলাম একটি ছিপ-ছিপে, লম্বা, অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে, অন্য অনেকের সঙ্গে টেবিলে ব'সে রয়েছে। বৌদি জিনিসটা যে কি তা তখনো বুঝিনি। তবে এটুকু বুঝলাম যে ঐ মেয়েটি শিগগিরই আমাদের সঙ্গে থাকবে। আর একজন বোন হবে, ভারি মজা হবে। তবে আরো একটু ছোট হলে সুবিধে হতো, আমার সঙ্গে মিলত ভালো। কমলার সেই প্রথম ছবি জীবনে আমি কখনও ভুলিনি—সতেরো বছর তার তখন বয়স, যৌবনের পূর্ণ সুষমায় ভরা।

কয়েক মাস পরে দিল্লীতে জওহরের বিয়ে হল। কমলা এল ঘরে। মনে আছে কত গর্বভরেই না বাবা-মা তাঁদের সুন্দরী পুত্রবধুকে সকলের কাছে দেখাতেন। শুধু সুন্দরই সে ছিল না। সে যেন

ছিল স্বাস্থ্যের সাম্য প্রতিমা। তার দিকে তাকিয়ে ভুলেও কারো মনে হয়নি যে জীবনের বেশির ভাগই তার রোগশয্যায় কাটবে। কমলা আর জওহরের দাম্পত্য জীবন শুরু হল সুন্দরভাবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাশ—মেঘ ছিল না কোনো। পরম সুখে কাটল কয়েক বছর। এমন সময় এক শীর্ণ অর্ধক্ষুধাতুর ব্যক্তি, অন্য অনেকের মতো এলেন আমাদের জীবনে, আর সমস্ত ঘটনাস্রোত গেল বদলে। রাষ্ট্রনীতি পেয়ে বসল বাবা আর জওহরকে, শুরু হল আকস্মিক পরিবর্তনের। ক্ষুদ্র এই ব্যক্তিটি —গান্ধীজী। পরিবারের সকলের মতো কমলাও সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ ক'রে তাঁর অনুরক্ত শিষ্যা হয়ে পড়ল। গান্ধীজিও তাকে স্নেহ করতেন অসীম, সেও তাঁকে ভক্তি করত অসীম, শ্রদ্ধা করত তাঁর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে।

দুঃখ ক্লেশ কী কমলা জানত না। বিয়ে হবার আগে এবং পরেও চিরকাল সে সহজ জীবন যাপন করেছে নির্ভাবনায়। কাল কি হবে এ-ভাবনা তার ছিল না। হঠাৎ সব পর্যবসিত হল অনিশ্চয়তায়, বিচ্ছেদে, ক্লেশে—এমন কি দৈহিক কষ্টে! হাসিমুখে নির্ভয়ে সব কিছুর সে সম্মুখীন হয়েছে। মনের মতো কিছু না ঘটলে মানুষ দোষ দেয় ভাগ্যকে। কমলার মুখে কিন্তু কখনো কোনো অভিযোগ শুনিনি, কখনো তার মুখে দেখিনি অসন্তোষের ছায়া। জওহর যখন দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করল, কমলা তার পাশে এসে দাঁড়াতে একটুও দ্বিধা করেনি। ভারতে এমন যদি কোনো যোদ্ধ্রী থাকে যার মনে আত্মচিন্তার বদলে শুধু ছিল দেশের চিন্তা, যার সাহস আর তেজ ছিল অতুলন—সে কমলা। কমলাকে খুব অল্প লোকই জানে। আমার এক বন্ধু বলতো: কমলার জীবন ছিল প্রদীপ শিখার মতো। কেঁপে

সে-শিখা একদিন উজ্জ্বল হল, তীব্র হল তার আলো; তারপর একদিন ফুরিয়ে গেল তেল, কাঁপতে-কাঁপতে নিভে গেল শিখা। কথায় বলে, 'দেবতার প্রিয় যারা, আগে মরে যায় তারা।' সে-কথা সত্যি। এমন কেউ ছিল না যে কমলাকে ভালো না বেসেছে, তার সাহসে মুগ্ধ না হয়েছে। তার উপরে সব সময় বিরাজ করত বাবার আর জওহরের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব—তবু সে রাষ্ট্রজীবনে নিজের স্থানটুকু আলাদা ক'রে নিতে পেরেছিল। মৃত্যু অকালে নিষ্ঠুরভাবে তাকে ছিনিয়ে না নিলে, খ্যাতির শীর্ষ আসন তার মিলত। দেখতে রোগা হলে হবে কি, সততায় দৃঢ় ছিল তার চরিত্র। তার শান্ত দৃষ্টি আর স্নিগ্ধ ব্যবহারের পেছনে যে এই শক্তি ছিল তা তাকে যারা ভালো ক'রে না জানত তাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব ছিল। গুণ যেমন তার অনেক ছিল তেমনি দোষও ছিল তার অনেক। জীবনে ছেলেমানুষী সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সময় সময় নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে এত উদাসীন হয়ে পড়ত যে, যত উপদেশই লোকে দিক না কেন, তার চেতনা কিছুতেই আসত না। অসুখে অসুখে তার জীবনটাই কেটে গেল, তবু কারো মনে হত না তার বয়েস হয়েছে। বিয়ের সময়ে তার যে চেহারা, যে মিষ্টি স্বভাব ছিল, তা তার শেষ পর্যন্ত ছিল। রোগ তাকে ভিতর-ভিতরে ক্ষয় করে ফেললেও বাইরে তার কোনো পরিবর্তন কোনোদিন দেখিনি।

বিয়ের পর কমলাকে খুব অল্পই দেখতে পেতাম। কিছুদিন কনে হিসেবে নিমন্ত্রণ-রক্ষাতেই বেশির ভাগ সময় তার কেটে যেত। তারপর তাকে ব্যাপৃত থাকতে হত গৃহকর্ত্রীর কাজে; কারণ মায়ের শরীর প্রায় সব সময়েই খারাপ থাকত আর বাবার উৎসব আপ্যায়ন তো লেগেই থাকত। ১৯২৬ সালে যখন

ইউরোপ যাই তখন কমলাকে ভালো ক'রে চিনবার সুযোগ হয়, গভীর বন্ধুত্ব হয় তার সঙ্গে। মেয়েদের জীবনের বহু সমস্যা নিয়ে, বিশেষ ক'রে মেয়েদের অধিকার নিয়ে যা শুনেছি বা পড়েছি, তাই নিয়ে তুমুল তর্ক হত তার সঙ্গে। কিন্তু কখনো ঝগড়া হত না। ইউরোপে সে বেশির ভাগ সময়েই শয্যাশায়ী ছিল। চলতে ফিরতে পারলেই তার সঙ্গে যে ক'মাস বেড়িয়েছি সেই ক'মাসই অপূর্ব কেটেছে। নতুন জিনিস দেখবার, শিখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার প্রবল। চড়ুইভাতি কিম্বা পার্টিতে সে খুব আনন্দ পেত; যত ক্লান্তই হোক কখনো নিজের ক্লান্তির জন্য অপরের আনন্দ নষ্ট করত না। অত্যন্ত বিরক্ত হলেও কখনো অভিযোগ করতে শুনিনি। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় কমলা আর আমি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। তখনই তার ক্লান্তিহীন কর্ম-দক্ষতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যাই। আমার স্বাস্থ্য তার চেয়ে অনেক ভালো হলেও কত সময় আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়িতেই থেকে গিয়েছি; কমলা থাকেনি। শীতের সকালে ভোর পাঁচটায় সে উঠত। আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকাদের ড্রিল করতে হত সেই সময়। তারপর আটটা থেকে শুরু হত বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং। সারা শীত ঠিক এমনিভাবে সে কাজ করে যেত। এল গ্রীষ্ম—উত্তপ্ত সূর্য, ভীষণ গরম; তবু কমলা তার কাজে রইল অটল। অনেকেই আমরা ছিলাম বটে, কিন্তু কতবার ক্লান্ত হয়েছি, অসন্তোষ প্রকাশ করেছি, ভেঙে পড়েছি। কমলার বিশ্বাস আর মনের জোর ছিল অদম্য। এমনি ক'রে নিজেকে সে ক্ষয় ক'রে দিল। তার মনের জোর যতই প্রবল হোক না কেন, তার ক্ষীণ দেহ তা সইতে পারল না। অবশেষে মৃত্যুই হল জয়ী।

শান্ত, এবং অনধিকারচর্চাশীল না হলেও, কমলার জীবন সম্বন্ধে কতগুলি স্থির মতবাদ ছিল। কোনো ব্যাপারে একবার মন স্থির ক'রে ফেললে কোনো অসুখই তার সংকল্পে কিম্বা কাজে বাধা দিতে পারত না। জওহরের প্রভাব তার উপর যথেষ্ট থাকা সত্বেও তার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ছিল স্পষ্ট।

নারীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা সম্বন্ধে কমলার আগ্রহ ছিল খুব। বন্ধু-বান্ধব এবং সহকর্মীদের সঙ্গে এ নিয়ে সে বহু তর্ক-বিতর্ক করেছে। এজন্য প্রায়ই পুরুষদের বিরাগভাজন হতে হত তাকে। তারা এসে বলত: কমলাদেবীর কথা শুনে তাদের স্ত্রীরা বড় অসুবিধা ঘটাচ্ছে। কোনো কষ্ট, কোনো অসুখই তার স্বাধীন সত্তাকে কোনোদিন ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে সে যে ন্যূনতম অংশও গ্রহণ করতে পেরেছে এবং জওহর যে এত লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রিয়—এই নিয়ে তার মনে মস্ত গর্ব ছিল। জওহরের খ্যাতিতে সে কখনও হিংসা করেনি।

১৯৩৪ সাল থেকে কমলার শরীর দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল, তাড়াতাড়ি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ভাওয়ালি স্বাস্থ্যনিবাসে। আমাদের সমস্ত আশা ও প্রার্থনা ব্যর্থ ক'রে তার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপই হতে লাগল। জওহর আবার তখন জেলে। এবারে অবশ্য আলমোড়া জেলে ছিল ব'লে কমলার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাতের অনুমতি পেত। সেই ক'টা দিনের জন্যে কী অধীর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত কমলা আর কী নিমেষেই না কেটে যেত সেই সময়! অবশেষে ডাক্তারেরা উপদেশ দিলেন তাকে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে। যাত্রা করার আগে কিছুদিন তার সঙ্গে থাকবার জন্যে আমি আর রাজা গিয়েছিলাম ভাওয়ালিতে। আমার দু'মাসের ছেলেকে দেখে কমলা মায়ের চেয়েও বেশি

আনন্দিত হয়ে উঠল। বলল, 'ফিরে এসে যদি দেখি ছেলেকে ভালো ক'রে মানুষ করছ না তাহলে ওকে আমি কেড়ে নেব কিন্তু।'

তার যাবার দিন জেল থেকে এসে বিদায় নেবার অনুমতি পেল জওহর। সেদিন তার মনের অবস্থা কী আমার পক্ষে বোঝা কঠিন, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকানো ছিল অসম্ভব। মনের ভাব যাতে মুখে না ফুটে ওঠে তাতে জওহরের চেষ্টার অবধি ছিল না, কিন্তু তার ব্যথাতুর চোখ তার মুখের গাম্ভীর্যকে ছাপিয়ে উঠছিল। বিদায়ের মুহূর্তে সে আর কমলা সাহসের হাসি হেসে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। তার পরে কমলা মোটরে পাহাড় থেকে নেমে গেল বম্বে-গামী ট্রেন ধরতে। মা আর আমাকে আলিঙ্গন ক'রে শুষ্ক চোখে জেলে ফিরে যাবার জন্যে পুলিশের অপেক্ষমান গাড়িতে জওহর গিয়ে উঠল। তার পিছন ফেরার ভঙ্গীতেই যেন জানতে পেলাম : সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তার পদক্ষেপের ক্ষিপ্রতা হয়েছে দূর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার বয়েস যেন বেড়ে গেল !

কয়েক মাস পরে কমলার অবস্থা খারাপ শুনে সে মুক্তি পেল। চলে গেল এরোপ্লেনে ইউরোপ। জার্মানির এক ছোট শহর ব্যাডেনউইলারে জওহর আর ইন্দিরাকে পাশে রেখে কমলা মারা যায়। সেদিন ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬।

১০

কিছু ছায়া কিছু আলো,
বিজয়োল্লাস কিছু, আর কিছু সিক্ত আঁখির প্রান্ত ;
উড়ে চলে যাওয়া বৎসরগুলি
ক্রমশঃ ভারাক্রান্ত !
—এডেন ফিলিপট

কমলার মৃত্যুর পর ইন্দিরাকে ইংলণ্ডের এক স্কুলে রেখে জওহর ফিরে এল ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠলেও ছেলের অন্ততঃ একমাস বয়েস না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই গিয়ে উঠতে পারলাম না। অতি দুঃখের এই যাওয়া। কমলার এই করুণ মৃত্যুর পর কি ক'রে তার সম্মুখীন হবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি নিজে কমলাকে ভালোবাসতাম; তাই বুঝতে পারছিলাম জওহরের ক্ষতির পরিমাণ কতখানি।

আনন্দ-ভবনে পৌঁছুতেই জওহর বেরিয়ে এল আমাদের নিতে। এই কয়েক মাস আগেও যার মুখে যৌবনের লালিত্য ছিল, সেই মুখে এখন পড়েছে শোকের, বয়সের রেখা। তাকে অসীম ক্লান্ত আর অবসন্ন দেখাচ্ছিল। শোক চেপে রাখতে তার প্রয়াসের অন্ত নেই, কিন্তু সব সময় কাছাকাছি যারা থাকে তাদের বুঝতে দেরি হয় না কত দুঃখভারাক্রান্ত তার ঐ বিষণ্ণ চোখ। দু'সপ্তাহ এলাহাবাদে থেকে বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ গেলাম কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে।

সেই বছরের অধিবেশনে জওহর সভাপতি। ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি দূরে সরিয়ে রেখে রাষ্ট্রনীতি নিয়েই সে মেতে উঠেছে, মন শূন্য হয়ে

গেলেও মন ভরে রেখেছে অজস্র সভাসমিতি এবং অসংখ্য কাজ দিয়ে। পরের বছরে কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে আবার সভাপতি নির্বাচিত হল জওহর।

ফৈজপুর অধিবেশনের পর, প্রাদেশিক আইনসভার জন্যে সারা দেশব্যাপী শুরু হল সাধারণ নির্বাচন। কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্যে জওহর ঝড়ের বেগে নির্বাচন-যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিলে। আইন-অমান্য আন্দোলনের জের দেশ তখন সবে কাটিয়ে উঠছে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে অজস্র সভা ক'রে দেশময় জওহর উৎসাহের বন্যা ছুটিয়ে দিল! সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল এবং অনেক আলাপ-আলোচনার পর ভাইস্রয়ের সঙ্গে সর্ত অনুযায়ী কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল। প্রায় সব মন্ত্রীই বহুদিন জেল খেটেছেন। এই মন্ত্রীদের ভিতর একজন হল আমার বোন স্বরূপ—ভারতে সর্ব প্রথম এবং একমাত্র নারী-মন্ত্রী।

ছেলেবেলা থেকেই স্বরূপ খুব কৌশলী মেয়ে—মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য একজন বটে। কোনো কারণে উত্তেজিত সে হয় না বললেই চলে। প্রশান্তচিত্ত তার সব ব্যাপারে। স্থির, মনোহারী, সুন্দরী সে। লোককে জয় করতে তার বেশি সময় লাগে না। সে মন্ত্রী হিসেবে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এ-ধরনের কাজ সে আগে করেনি, কঠিন লাগা বিচিত্র নয়, তবু আশাতীত সাফল্য আর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে। দিদি ক্রমশঃ যখন রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠল আমরা তার বলবার ক্ষমতায় অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল এ যেন তার জন্মগত ক্ষমতা। যত বড় জনতাই হোক না কেন, ভয় পেতে তাকে কোনোদিন দেখিনি। হিন্দুস্থানী এবং ইংরেজি—দু'ভাষাতেই তার সহজ, অনর্গল বচন-ক্ষমতা।

অকালে চুল পাকা আমাদের বংশের ধারা। স্বরূপের চুল ছেলে-বয়সেই পাকতে শুরু ক'রে অল্পদিনেই একেবারে শাদা হয়ে যায়। এখন তার চুল নতুন রুপোর মতো—এতে তার সৌন্দর্য বেড়েছে বৈ কমেনি।

মা এবং গৃহকর্ত্রী হিসেবেও স্বরূপ সুনিপুণ। রাষ্ট্রনীতিতে তার বেশির ভাগ সময় কেটে গেলেও তার মধ্যেই সময় ক'রে সে ছেলে-মেয়ের দেখাশুনা ও ঘরকন্নার তদারক করে।

জওহর বছরে দু-তিনবার বম্বে এসে আমাদের সঙ্গে থাকত। বড় ভালো লাগত তাকে পেয়ে, কিন্তু কাছে বিশেষ তাকে পাওয়া যেত না। অসংখ্য কাজকর্ম ও লোকের সঙ্গে দেখাশোনা করতে সে সব সময়েই ব্যস্ত থাকত। তার আসার দরুন আমাদের বাড়ির সাধারণ শান্ত ব্যবস্থা একেবারে বদলে যেত। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত লোক আসছে তো আসছেই—কেউ বা আগে থেকে সময় ঠিক করে এসেছে, কেউ বা সোজা এসেছে তাকে দেখবার জন্যে। হয় টেলিফোন বাজছে নয় দরজার ঘণ্টা—আমার সময় কাটত এই দুই-এর মধ্যে। কখন খাবে ঠিক নেই, নিজের ব'লতে সময় তার কিছু নেই। দুপুরে কিম্বা রাতে কতজন লোক খাবে তারও কোনো ঠিক ছিল না। তাই আমার রান্নার ব্যবস্থাটা এমন ভাবে আয়োজন করতে হয়েছিল যে বলবামাত্র দশ বা বিশ জনের খাবার চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে যেত।

সারাক্ষণ জীবনটা ছিল একটা একটানা ছুটের উপর। মিটিং-এ সঙ্গে গেলে আলাদা কথা—তা না হলে শুধু খাবার সময় ছাড়া তার সঙ্গ পাওয়া যেত না। খুব বিরল অবকাশে তাকে যখন কাছে পাওয়া যেত তখন গল্পে, আলাপে, আলোচনায়, হাসি-ঠাট্টায় সময় জমে উঠত। মাঝে মাঝে পারিবারিক কথাও

উঁকিঝুঁকি মারত। কোনো নির্জন সন্ধ্যায় জওহর হয়তো কবিতা পড়ে বা আবৃত্তি ক'রে শোনাত। তার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হবার মতো জিনিস।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পক্ষাঘাতের আকস্মিক আক্রমণে মা মারা গেলেন, আর চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যেই ঐ একই রোগে মাসীমাও তাঁর অনুগমন করলেন। পর পর এই দুটো আঘাত বড় কঠিন হয়ে বাজল আমাদের বুকে। দুঃখে হতবুদ্ধি হয়ে বম্বে ফিরে এলাম। বুঝলাম মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সে-পুরনো জীবনের পরিবর্তন শুরু হল ; বাড়ি আর সে-বাড়ি রইল না।

সেই বছরেরই শেষ দিকে জওহর ইন্দিরাকে দেখতে ইউরোপে যাচ্ছিল। সঙ্গে রাজার আর আমার যাওয়া ঠিক হলেও শেষ পর্যন্ত রাজার পক্ষে কাজ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হল না। সে বললে, 'তুমি যাও না ভাই-র সঙ্গে।' কিন্তু তাকে এবং কোলের দুই ছোট ছেলেকে ফেলে যেতে মন চাইল না। তাছাড়া বরাবর আমার একটা ইচ্ছা ছিল রাজাকে সঙ্গে নিয়ে একবার ইউরোপ যাবার। পরে যখন দেখলাম প্রবল গৃহযুদ্ধের মধ্যেও জওহর স্পেন ঘুরে এল তখন মনে সত্যি দুঃখ হয়েছিল—কেন গেলাম না ওর সঙ্গে। উত্তেজনার কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটাই না হত! ইন্দিরার তখন ছুটি, তাকে নিয়ে জওহর দেশে ফিরে এল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে পড়াশুনো শেষ করবার জন্যে ইন্দিরা আবার বিলেত যাওয়া ঠিক করল। আবার ঠিক করলাম রাজা আর আমি আমাদের পৃথিবী ভ্রমণের পথে খানিকটা পথ ইন্দিরার সঙ্গে যাব। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাজ ছেড়ে যেতে রাজা রাজী হল না। স্থগিত রইল যাওয়া। টিকিট ফিরিয়ে দেওয়া হল শেষ মুহূর্তে। মনে আশা : দিগন্তে

যুদ্ধের মেঘ জমলেও পরে একদিন ঠিকই যাব। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেল। যাওয়া আর হল না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ইন্দিরা স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসবার বন্দোবস্ত করলে। কঠিন এক অসুখের পর সে কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিল। প্রথম যে এরোপ্লেন্-এ জায়গা মিলবে সেইটিতেই ইন্দিরা চলে আসবে শুনে মনে আনন্দ হল, উদ্বেগও হল। জওহর তখন দেরাদুন জেলে। তাকে চিঠি দিলাম আমার উদ্বেগের কথা জানিয়ে। আমার এই বার্ধক্যসুলভ শঙ্কায় ভর্ৎসনা ক'রে যথারীতি উত্তর এল তৎপর: 'ইন্দু চলে আসছে শুনে খুশি হয়েছি। পথে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে কিন্তু নিঃসঙ্গ অবস্থায় একা দুঃখ পাওয়ার চেয়ে সে-বিপদের সম্মুখীন হওয়া ভালো। সে যদি ফিরে আসতে চায়, আর যদি সত্যিই ফেরে তার ফলাফল তাকে মেনে নিতেই হবে'

১১

সারারাত জেগে তার শ্বাস ফেলা দেখেছি,
তার বুকের মধ্যে জীবনের তরঙ্গ দোলার সঙ্গে
কোমল আর ক্ষীণ তার নিঃশ্বাস পতন,
আমাদের আশাই আমাদের ভয়কে করেছে ছলনা,
ভয় আমাদের আশাকে করেছে বিদ্রূপ,
যখন সে ঘুমিয়ে তখন সে বুঝি মুমূর্ষু,
মুমূর্ষু যখন, তখন ভেবেছি সে বুঝি ঘুমিয়ে,
বর্ষণ ধারার শৈত্য-জড়িত
করুণ অস্পষ্ট ভোর যখন হল,
চোখের পাতা তখন তার মুদ্রিত।
আমাদের জগতের বাইরে
আর এক প্রভাতে সে তখন উত্তীর্ণ।

—টমাস হুড

ভারি সুন্দরী মানুষ ছিলেন আমার মা। ছোট্ট ফুটফুটে মানুষটি, লম্বায় পাঁচ ফুটও নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে, আকৃতিতে খাঁটি কাশ্মীরী—ঠিক যেন ননীর পুতুল। কিন্তু পুতুলের মতো নরম কিম্বা আরামের মানুষ তিনি ছিলেন না—পরবর্তী জীবনে তা প্রমাণিত হয়েছিল।

এক ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে ছোট। তাঁর সব চেয়ে বড় বোন বয়েসে দশ বছরের বড়। তিনিই মানুষ করেছিলেন মা-কে। তাই দু'জনের মধ্যে প্রীতি ছিল অপরিসীম। বাড়িতে সব চেয়ে ছোট আর তিন বোনের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী ব'লে সকলেই তাঁকে অত্যন্ত আদর করত, আদরের পুত্তলীর মতো

মানুষ হয়েছিলেন—তাঁর বয়সী মেয়েদের প্রতি যে ব্যবহার সাধারণ তা তিনি পাননি। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে তিনি শ্বশুরের ঘরে আসেন—সেখানে কেউ বা ছিল সদয় কেউ বা ছিল রূঢ়। আমার ঠাকুমা সেকেলে জাঁদরেল মেয়েমানুষ ছিলেন, এবং সাধারণ সব শাশুড়ীর চেয়ে বিশেষ কিছু অন্যরকম ছিলেন না। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত মায়ের জীবনে সুখ আসেনি। কিন্তু নিজের বাড়িতেও তাঁকে রাখা হত অমূল্য সম্পদের মতো; একটি মেয়ের জীবনে যত রকম কামনা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার প্রয়োজন বাবা তা দিয়ে মাকে ঘিরে রাখতে অর্থব্যয়ের কোনো কার্পণ্য করেননি। তবু সব কিছু পাওয়া সত্ত্বেও সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটিই মা-র ছিল না—সে হচ্ছে স্বাস্থ্য।

জওহর জন্মাবার পর থেকেই মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল—প্রায়ই কঠিন অসুখে পড়তেন। প্রতিবারই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়তেন। কোনো ওষুধই যেন তাঁকে সারাতে পারত না। বাবা তাঁকে ইউরোপে নিয়ে গেলেন সেখানকার সেরা ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যে। তবু কিছু ফল হল না। আমার তো মনেই পড়ে না কখনও মা-কে সুস্থ সবল অবস্থায় অন্যান্যদের মতো খেয়ে ঘুমিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেখেছি। মায়ের যত্ন কাকে বলে আমি কখনো জানিনি—তাঁকেই সব সময় অত্যন্ত যত্নে রাখতে হত।

এমনি ক'রে দিন কাটছিল। আমার কাছে মা ছিলেন অত্যাশ্চর্য দুর্লভ একটি ফুলের মতো, সমস্ত বিপদাপদ থেকে সযত্নে রক্ষিত, জীবনের ভাবনা-চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত যত্নে, প্রেমে, বিলাসিতায় মা তাঁর ছোট্ট রাজ্যে

ছিলেন রানীর মতো, মহানুভব স্বামী আর পুত্রেগর্বে গর্বিতা, নিজ গৃহে গৌরবান্বিতা। অসহযোগ আন্দোলন না আসা পর্যন্ত শোক-তাপের মুখ তিনি দেখেননি। এল অসহযোগ আন্দোলন : কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সারা জীবনের অভ্যাস-আচরণ কোথায় তলিয়ে গেল—সারা সংসারে বয়ে গেল যেন একটা ছোট-খাটো বিপ্লবের ঝড়।

নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমাদের অবশ্য খুব কষ্ট হয়নি। কিন্তু মা আর বাবার পক্ষে এই পরিবর্তনের অর্থ হল সারাজীবন-লব্ধ ভাবধারার পরিবর্তন। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দাঁড়িয়ে, পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে এ-পরিবর্তন বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাঁদের গত জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে এবং নতুনের এই সহজ সম্পূর্ণ গ্রহণে আমরা অবাক না হয়ে পারলাম না। ভালো খেতে, ভালো পরতে এবং অপর্যাপ্ত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে বাবা ভালোবাসতেন। জীবনের সর্ব সুখের সামগ্রীতে তিনি অভ্যস্ত। মা-র শরীরে মহার্ঘ, শ্রেষ্ঠ শাড়ি ছাড়া কোনোদিন ওঠেনি। যা চাইতেন অনায়াসে তা পাওয়াই তাঁর ছিল অভ্যাস। দৈন্যের সঙ্গে তিনি ছিলেন অপরিচিত। তবু বিনা দ্বিধায় তিনি এমন খদ্দরের শাড়ি পরতে শুরু করলেন যার ভার-বহনেই তিনি অক্ষম।

তারপরে তাঁর জীবনে এসেছে শুধু বেদনা, স্বার্থত্যাগ, অসীম দুর্ভাবনা আর প্রিয়জনের কাছ থেকে কারাগারের দুঃসহ বিচ্ছেদ। কিন্তু যাঁকে আমরা ভাবতাম কোনো পরিশ্রমে অক্ষম, তিনিই দেখালেন তাঁর ঐ ভঙ্গুর দেহে কী অদ্ভুত সাহস এবং সংকল্প লুক্কায়িত ছিল—যা কোনো গ্লানি বা শোক কোনোদিন স্পর্শ করতে পারে না।

তখন থেকে সময় তাঁর খুব কষ্টে কেটেছে। তাঁর সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাময় জীবন এই শেষ বয়েসে এই পরিবর্তনের ফলে যে অনিশ্চয়তা এবং কষ্টের মধ্যে গিয়ে পড়ল তার জন্যে কোনো অনুতাপ বা অভিযোগ কোনোদিন শুনিনি তাঁর মুখ থেকে। আরো অদ্ভুত এই যে : এত কষ্ট সত্বেও মা-র স্বাস্থ্য ভালো ছিল। বাবার মৃত্যুতে অবিশ্যি একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। সনাতনপন্থী তিনি, ভাবতেন পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর অপরাধ করেছিলেন যার ফলে এ-জীবনে তাঁকে স্বামী হারাতে হল। তাছাড়া দুর্বল এবং রুগ্ন ব'লে তাঁর ধারণা ছিল—হিন্দু-স্ত্রীর সনাতন অধিকার অনুযায়ী তিনিই আগে মারা যাবেন। বাবার আবার অসুখও কখনো করত না। জেলের কষ্টেই তাঁর অকাল-মৃত্যু হয়েছিল নিশ্চয়।

পঞ্চাশ বছর সুখে দুঃখে একসঙ্গে কেটেছিল তাঁদের জীবন। শারীরিক বা মানসিক যে কোনো বিপর্যয়ে তিনি বাবার উপরই নির্ভর করতেন। আর বাবা—সুখের দিনে যেমন, দুঃখের দিনেও তেমনি—যত্নে, প্রেমে মা-কে রক্ষা করতেন। তাঁর অবর্তমানে মা কেমন যেন সব খেই হারিয়ে ফেলতেন। বহুদিন ধরে মা নিজেকে যেন খাপ-ই খাওয়াতে পারেননি। এইসব সময়েই জওহরকে দেখেছি তাঁর আদর্শ ছেলে হিসেবে। নিজে শোকে অভিভূত, ভগ্নপ্রায় হলেও সে যেমন ক'রে পারে মায়ের শোক লাঘব করার চেষ্টা করত। তখনকার তার সেই শান্ত, ধীর অনুরাগ এবং অকুণ্ঠ সেবা স্বর্গীয় জিনিস—তার বর্ণনা করা যায় না।

মা যেন তাঁর ছেলেপিলের জন্যেই বেঁচে রইলেন—বিশেষ ক'রে জওহরের জন্যে। এল কমলার মৃত্যুর আঘাত—এ যেন তিনি আর

সইতে পারলেন না। দিনে দিনে তিনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগলেন।

ছেলেপিলে নিয়ে বৎসরান্তে যেমন আসি, তেমনি সেবার এলাহাবাদে এসে এক মাস থাকলাম ১৯৩৮ সালে। যখনই বম্বে ফিরতে চাই মা কেবলই দিন পিছিয়ে দিতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যায় আমরা সবাই রয়েছি: জওহর, স্বরূপ, তার স্বামী, তাদের ছেলেপিলে এবং আমি। মা বেশ ভালো বোধ করলেন এই ক'টা দিন। আজকে সন্ধ্যায় তিনি অনেক গল্প বলতে লাগলেন।

আমাদের খাবার সময়েও মা উপস্থিত রইলেন—আজ তাঁর মনটা পূর্বস্মৃতিতে ভরপুর। বেশ লাগছিল মা-র কথা শুনতে। খাওয়ার পরেও প্রায় সাড়ে-দশটা পর্যন্ত চলল কথাবার্তা। স্বরূপের সেদিন আবার মধ্যরাত্রির পরে লক্ষ্ণৌ যাবার কথা। মা বললেন, 'আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। স্বরূপ স্টেশনে না যাওয়া পর্যন্ত জেগেই থাকি।' আমরা কত ক'রে বললাম তাঁকে শুতে যেতে, তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বসে গল্পই চলতে লাগল। ধীরে ধীরে মা শান্ত হয়ে এলেন।

এগারোটার সময় স্বরূপ তৈরি হয়ে নিয়ে মা-র কাছে গেল বিদায় নিতে। উঠে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়েই মা কেমন কুঁকড়ে গেলেন। পড়েই হয়তো যেতেন যদি আমি আর জওহর ছুটে গিয়ে স্বরূপকে না সাহায্য করতাম। বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর আগে দুবার মা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এই তৃতীয় আক্রমণ। ডাক্তার এসে বললেন কোনো আশা নেই—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। ভাবিনি এ-ভাবে মৃত্যু আসবে—একেবারে

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা কথা না ব'লে, একটা চুমো না খেয়ে, বিদায় না নিয়ে—কেমন ক'রে মা চলে যেতে পারেন! এক ঘণ্টার জন্যে বাড়ির বাইরে গেলে তিনি চুমো না খেয়ে যেতে দিতেন না। নাঃ—এ হতেই পারে না। ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস হল না। রাগ হল তাঁর উপর—আমাদের মতো কিছু না ক'রে তিনিও চুপ ক'রে বসে আছেন দেখে।

সারা রাত তাঁর বিছানার পাশে বসে কাটালাম—জওহর, স্বরূপ, আমি আর মাসিমা বিবি আম্মা। ভোর পাঁচটার সময় হঠাৎ মায়ের শ্বাসকষ্ট থেমে গেল; শান্ত হয়ে তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। অতি মৃদুস্বরে সজল চোখে জওহর বলল: 'মাও গেলেন।' আমাদের এত আদরের মা এ-ঘুম থেকে আর জাগবেন না। এতক্ষণের ব্যর্থ অবিশ্বাস অসহ্য দুঃখে পরিণত হল। অন্য সকলের সঙ্গে নিঃশ্বাস রোধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম শয্যাপার্শ্বে। চোখের সব জল যেন শুকিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সময়ে মাসীমা ঘরে ছিলেন না। জওহর আর স্বরূপ গেল তাঁকে খবর দিতে। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম মায়ের পাশে। চোখ ভেঙে জল এল স্রোতের মতো। ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে বসে নিঃশব্দে শেষ বিদায় নিলাম। পাছে আমার কান্নায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়—তাই ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

হাজারে হাজারে লোক এল মায়ের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায়। ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিলাম মাকে, কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাঁকে। সমস্ত কুঞ্চনরেখা কোথায় বিলীন হয়ে গেল, জীবন্ত মসৃণ হয়ে উঠল মুখ। দেখে মনেই হচ্ছিল না তাঁর আর প্রাণ নেই।

আবার আনন্দ-ভবন ছেয়ে গেল শোকে আর বিষাদে। কর্ত্রীহীন গৃহের সে কী শোকার্ত মূর্তি!

১২

নাম ছিল কারো, খ্যাতি আর সম্মান ;
পণ্ডিত তারা বিজ্ঞ ও মহাবল ;
কেউ নামহীন চিরদরিদ্র মূঢ়
ব্যথা ও পীড়ন ছাড়া নাই সম্বল।
—উইলিয়াম মরিস

আমাদের বড়-মাসিমাকে আমরা 'বিবি আম্মা' ব'লে ডাকতাম। তিনি বালবিধবা। জীবনে আর কোনো আকর্ষণ না থাকায় তিনি মায়ের সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। মা আর মাসিমা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মাসিমা যৌবনের প্রারম্ভেই আঘাত পেয়ে বুঝে নিয়েছিলেন যে জীবনের পথ তাঁর জন্যে প্রশস্ত হয়ে তৈরি হয়নি, তাঁকে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে, নির্ভর করতে হবে নিজেরই উপর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর বিবেচনা খাটিয়ে তিনি নিজেকে নির্দয় কঠোর জগতের জন্যে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন, কারো অনুকম্পা কোনোদিন যাচঞা করেননি। তিনি ইংরেজি একেবারেই জানতেন না, কিন্তু সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ছিল। যে কোনো কাজই চট ক'রে বুঝে নেবার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। বাবা বলতেন, সুযোগ এবং শিক্ষা পেলে বিবি আম্মা অনায়াসে বড় উকিল হতে পারতেন। তাঁর চাতুর্য আর বুদ্ধির সঙ্গে এসে মিশেছিল তাঁর অপূর্ব রসিকতা-বোধ।

বিধবা তিনি, নিজের কোনো বাড়ি ছিল না, তাই আত্মীয়-স্বজনদের কাছেই থাকতেন। বছরের বেশির ভাগ তাঁর কাটত আমাদের কাছে—খুব ভালো লাগত আমাদের। যখন এখানে

থাকতেন মা-কে তিনি ঘরকন্নার নানান কাজে সাহায্য করতেন। মায়ের যদি কোনো অসুখ হত—দিন নেই রাত নেই নিজের কথা ভুলে তাঁর সেবা করতেন। বোন, বোন-পো আর বোন-ঝিকে নিয়েই ছিল তাঁর জগত। নিজের এক ভাইকে মাসিমা খুব ভালোবাসতেন, দুঃখের বিষয়, অনেক দিন আগে তিনি মারা যান। তাই তাঁর জীবনের কেন্দ্র ছিলেন আমার মা। বিবি আম্মার মতো বোনের প্রতি এত স্নেহ খুব কম লোকেরই আমি দেখিছি।

আমিই তাঁর খুব প্রিয়পাত্রী ছিলাম। ছোট বয়সে তাঁর কাছে কত রূপকথা, ভারতের গৌরবময় অতীতের কত বীর নারী, কত বীরপুরুষদের কথা শুনতাম, ভারি ভালো লাগত। আমার কেমন মনে হত: এই সব চিরস্মরণীয় বীর নরনারীদের মতো বিবি আম্মাও একজন হতে পারতেন। তাঁর সাহস ছিল অদম্য, তাঁর মতো নির্ভিকহৃদয় বিরল। তাঁর প্রতি আমার গভীর অনুরাগ ছিল।

সনাতন প্রথায় জীবন যাপন করলেও এবং মায়ের চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের বড় হলেও তাঁর মন মায়ের চেয়ে অনেক উদার ছিল। মায়ের মতোই আধুনিক ভাবধারাকে তিনি ভয় পেতেন। বব্-চুল আর হাতা-বিহীন ব্লাউজ তিনিও সইতে পারতেন না। কিন্তু কখনো কোনো মন্তব্য করতেন না। আমরা যখন জোর ক'রে তাঁর মতবিরুদ্ধ কোনো ব্যাপারে কিছু বলাবার চেষ্টা করতাম, তিনি একেবারে সটান আমাদের অবজ্ঞা ক'রে যেতেন। মা ছিলেন অন্যরকম, নানাভাবে তিনি তাঁর আপত্তি এবং অননুমোদন জ্ঞাপন করতেন, বিশেষ সুবিধে অবিশ্যি হত না তাতে। মাসিমা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে কিছু করাতে চাইতেন না,

শুধু চাইতেন আমরা যেন অত আধুনিক ভাবাপন্ন না হই, একটু যেন সামলে চলি।

বিবি আম্মার কাছে আমার যে শুধু স্নেহের দাবিই ছিল তা নয়। আমার যত গোপন কথা সবই তাঁর কাছে বলা যেত। কোনো একটা ব্যাপারে মায়ের কাছে যেতে যখন সাহস পেতাম না, তাঁর কাছে নির্ভয়ে যাওয়া চলত। কী ক'রে ঠিক জানি না, তিনি আমার মনের কথাটা ঠিক বুঝে নিতেন।

মা-কে নিজে ভেবে-চিন্তে কখনও কিছু করতে হত না, সব বিষয়ে অপরের ওপর নির্ভর করাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। তাই তাঁর কাছে কোনো উপদেশ চাইতে গেলেই তিনি মুশকিলে পড়ে যেতেন। মা-র সম্বন্ধে আমাদের ভাবটা ছিল এই : দুর্বলা, সুদর্শনা মানুষ তিনি—তাঁকেই আমাদের দেখাশোনা যা-কিছু করার তা করতে হবে, আমাদের দেখাশোনা করা তাঁর কর্ম নয়। তাই ছোটখাটো আমার যত সমস্যা সবই নিয়ে যেতাম বিবি আম্মার কাছে। তাদের সমাধান ক'রে দিতে বিবি আম্মা একদিনও আমাকে নিরাশ করেননি।

মা মারা গেছেন—এ-কথা তিনি বিশ্বাসই করলেন না। বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি বড় বোন—সুস্থ দেহে বেঁচে, আর তাঁর ছোট বোন কিনা এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল! ধীরে ধীরে ব্যাপারটা তাঁর উপলব্ধির মধ্যে এল। যে-নির্ভীক হৃদয় এত আঘাত সহ্য করেছে অবলীলায়—সেই হৃদয় আর এই আঘাত সামলাতে পারল না। সেই আঘাতে সান্ত্বনা দেবার শক্তি কোনো মানুষের ছিল না। মুহ্যমান হয়ে গেছেন, তবু তাঁর প্রথম চিন্তা হল কি ক'রে আমাদের সান্ত্বনা দেবেন। সৎকারের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের জানা ছিল না। তিনিই সব করলেন। যে-

বোনকে সারাজীবন মানুষ করেছেন, সযত্নে তার শেষ-কৃত্যের ব্যবস্থাও নিজের হাতেই তিনি শেষ করলেন।

শব-শোভাযাত্রা রওয়ানা হয়ে গেল ··· বিবি আম্মা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে, এক বিন্দু অশ্রু না ফেলে, ফুলে সাজানো তাঁর সহোদরাকে যতক্ষণ দেখা যায় উপরের বারান্দা থেকে একভাবে দেখতে লাগলেন। তারপরে ফিরে গেলেন মায়ের ঘরে। আমি নিঃশব্দে পিছন পিছন গিয়ে দেখি যেন শেষবারের মতো তিনি তাঁর বোনের শখের জিনিসপত্রগুলি দেখে নিচ্ছেন। আমি তাঁর গলা জড়িয়ে বললাম, 'বিবি আম্মা, একটু শোবে চলো।' আমার কথা উপেক্ষা ক'রে শুষ্ক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও, স্নান ক'রে এস বেটি। আমি ততক্ষণে একটু চা ক'রে আনি।' বেলা তখন দুটো, তবু কোনো কথা না ব'লে স্নান সেরে নেমে এসে দেখি চা তৈরি। গলা দিয়ে গেল না চা—বিবি আম্মার বিহ্বল মূর্তি কেবল জেগে উঠতে লাগল মনে ··· কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কোথায় আছেন খুঁজতে গিয়ে দেখি মায়ের ঘরে, মা যেখানে শুতেন ঠিক সেখানেই শুয়ে আছেন বিবি আম্মা। আমি নিচু হয়ে ডেকে বললাম, 'বিবি আম্মা, তুমি একটু চা খাবে না?' জবাবে চোখ মেলে তিনি তাকালেন বটে, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। বললাম, 'বিবি আম্মা, এতদিন তো তুমি ছিলে আমাদের মায়ের মতো, আজ ··· আজ তো তুমি সত্যিই হলে আমাদের মা। তুমি ছাড়া আর আমাদের কে আজ আছে বলো!' আমার গলা জড়িয়ে কেঁদে (এই প্রথম) তিনি বললেন, 'বেটি, তুই তো চিরকালই আমার পেটের মেয়ের মতো! কিন্তু মানুষের মা থাকে একটাই, সে মা তোর চ'লে

গেছেন ; তাঁর স্থান আমি কি আর পূরণ করতে পারি ! আমি যে বেঁচে ছিলাম তা তোর মা'রই জন্যে। সে-ই যদি না থাকল— আমার বেঁচে লাভ নেই। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমাকেও এখন যেতে হবে।' কান্না চাপতে গিয়ে কথা বলতে পারলাম না। ব'সে ব'সে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই নিঃশব্দে উঠে গেলাম। তারপর যতবার ঘুরে আসি, দেখি ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ কী-রকম ভয় হল। গিয়ে নাড়া দিলাম, কোনো সাড়া নেই। অনেকবার ডাকলাম, তবু সাড়া নেই। জওহর তখনও শ্মশান থেকে ফেরেনি। স্বরূপকে গিয়ে বললাম। সেও ভয় পেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডাকতে পাঠালাম। ডাক্তার এলেন। সাতটার সময় জওহরও ফিরে এল। বিবি আম্মাকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন মায়ের মতো এঁকেও পক্ষাঘাত আক্রমণ করেছে। ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করি কী ক'রে ? পক্ষাঘাত তো দূরের কথা, জীবনে কোনোদিন তাঁর অসুখ করেছে কিনা সন্দেহ। সেই বিবি আম্মা শুয়ে রয়েছেন অচেতন অবস্থায়—কারও কিছু করবার বাইরে। সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল— আমিই সব চেয়ে বেশি। আমিই তাঁকে ভালোবাসতাম সকলের চেয়ে বেশি। গত রাত্রে সকলে যেমন ব'সে ব'সে কাটিয়েছি— তেমনি ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। মুহ্যমান অবস্থা —নড়তে-চড়তে মন বিদ্রোহ করছিল, অনড় অবস্থায় ব'সে রইলাম। যত দিন, যত বছর বিবি আম্মা আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন ; যত স্নেহ, যত ভালোবাসা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি ; মা'র প্রতি, আমাদের সংসারের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ অনুরাগ—এই সব স্মৃতি একত্র হয়ে মনে জমতে লাগল।

হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটে চুরমার হয়ে যায়, মনে হচ্ছিল আরাম পাব তাতে—কিন্তু সে-আরাম মিলল কই! শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগলাম বিবি আম্মার নিরুদ্বেগ মুখ। ভাবতে লাগলাম কেন এমন হয়। কাটল দুঃখের রাত। চব্বিশ ঘণ্টা পরে, ঠিক যে-সময়ে মা মারা গিয়েছিলেন, সেই ভোর পাঁচটায় বিবি আম্মা মারা গেলেন। মা আর মাসিমা একসঙ্গে এই অল্প সময়ের মধ্যে এইভাবে আমাদের ফেলে চলে যাবেন তা যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

গত কাল মায়ের সৎকার হয়েছে, আজকে হল মাসিমার—কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বিবি আম্মা সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাই তাঁর সৎকারে আচার-অনুষ্ঠানের বালাই নেই। শুধু কুঙ্কুম রঙের শাড়ি পরিয়ে দিলাম একখানা—অঙ্গের ভূষণ হল তাঁর নিজেরই রূপ। মুখ থেকে বয়সের রেখাঙ্কন কোথায় মিলিয়ে গেল, ফিরে এল যেন যৌবনের মসৃণতা। এমন অদ্ভুত একটা শান্তি বিরাজ করছিল তাঁর মুখে, মনে হচ্ছিল আদরের বোনের সঙ্গে আবার যেন তাঁর মিলন হয়েছে—মরণও তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

মায়ের শবানুগমন করেছিল অসংখ্য নরনারী। রানীর মতো ঐশ্বর্যে ভূষিত ক'রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্মশানে। বিবি আম্মার জন্যেও এল অনেক লোক—কিন্তু ভিন্ন ধরনের লোক। সমানে আসতে লাগল কত দরিদ্র, অসমর্থ, বৃদ্ধ—ছিন্ন মলিন বস্ত্র তাদের। তারা এসেছে তাদের 'দেবী'কে শেষ প্রণাম জানাতে। এদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন তিনি। যত দরিদ্র, যত নিম্নশ্রেণীরই হোক না কেন, সাহায্য বা উপদেশের জন্যে তাঁর কাছে তারা অবাধে আসত। আর তিনিও

অকুণ্ঠচিত্তে যথাসাধ্য করতেন তাদের জন্য। তাঁর জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল সরল, তাই যাদেরই তিনি ভালোবাসতেন তাদের জীবনের সব-কিছুতেই অংশগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজ। দরিদ্র যারা, অভাব যাদের, তাদের সাহায্য করতেন তিনি দু'হাতে। তাই বিবি আম্মার মৃত্যুতে সকলে তারা মস্ত বড় এক সহায় হারাল। সুস্থ, নীরোগ দেহের মানুষ, মায়ের মৃত্যুর মাত্র একদিন পরেই দেহত্যাগ করায় লোকে বলল, 'উনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সাধারণ মানুষ হলে কি আর এমনি ভাবে যেতে পারতেন!'

এই সব দরিদ্র দুস্থ লোকেদের তাঁকে একবার দেখবার জন্যে কী আগ্রহ—দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর সেই আড়ম্বরহীন শবাধার যখন রওয়ানা হয়ে গেল, তখন এমন একটি লোক আমি দেখিনি যার চোখ শুষ্ক ছিল, এমন লোক সেখানে ছিল না যার হৃদয় শোকার্ত হয়ে ওঠেনি। আমার এত ভালোবাসার মাসিমাকে নীরবে বিদায় দিলাম। তাঁর এই মৃত্যু তাঁর পক্ষে ভালোই হয়েছে বলতে হবে। বোনকে হারিয়ে একা তিনি কিছুতেই থাকতে পারতেন না। আমরা অবিশ্যি ভাবি, আমাদের দিকে চেয়ে এত তাড়াতাড়ি তাঁর না গেলেই ভালো হত। পর পর এত বড় দুটো আঘাত জীবনে ভুলবার নয়।

১৩

ক্ষান্ত হও ! ঘৃণা আর মৃত্যুই কি ফিরে আসবে ?
মানুষের বাঁচা মানে শুধু মারা আর মরা ?
ক্ষান্ত হও ! ভবিষ্যতসম্ভাবনার তিক্ত গণনার পাত্র
শেষ ক্লেদ বিন্দু পর্যন্ত উজাড় করে ফেলো না।
বিশ্ব তার অতীতের ভারে ক্লান্ত,
থাক না সে অতীত ম'রে
শেষ বিশ্রাম তাকে পেতে দাও।

—শেলি

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সিংহল যাবার সময় জওহর আমাকে যখন তার সঙ্গী হতে আমন্ত্রণ করলে আমি সানন্দে রাজী হলাম। সিংহল দেখবার ইচ্ছা আমার অনেকদিন থেকে, কিন্তু নানা কারণে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

জওহরের যাওয়ার এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সিংহলী এবং ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃই জমে উঠছিল। তাই জওহরকে পাঠানো হল সব দেখেশুনে সম্ভব হলে একটা মীমাংসা ক'রে আসতে।

এক কুয়াশায় ভরা সকালে পুনা এরোড্রোম থেকে একটি ছোট্ট এরোপ্লেনে আমরা যাত্রা করলাম। কংগ্রেসকর্মী আর বন্ধু-বান্ধবদের একটি ভিড় জমে উঠেছিল আমাদের বিদায় দিতে—অত সকালেও। হায়দ্রাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) মিসেস নাইডু এবং এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে আনন্দে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে, মাদ্রাজ ত্রিচিনাপল্লী হয়ে, পরের দিন কলম্বো পৌঁছুলাম। মাউণ্ট ল্যাভিনিয়া এরোড্রোমের উপর এসে দেখলাম অনেক লোক জমেছে নিচে।

আমাদের পাইলট বেশ চালাকচতুর লোক, তখনই না নেমে খানিকক্ষণ চক্রাকারে ঘুরে হঠাৎ নেমে আবার উঠে এল—যেন অভিবাদন করল। নামা মাত্র সমবেত জনতা ছুটে এল এরোপ্লেনের কাছে। অনেক কষ্টে তাদের সামলানো গেল। এগিয়ে এসে অনেকে জওহরের করমর্দন করলেন। চারদিকে আন্তরিক হাসি আর অভ্যর্থনা—মনে হল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই এসে পড়েছি।

সিংহলী আর ভারতীয়রা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যে-ভাবে অভ্যর্থনা করল, তাতে মনে হল হয়তো জওহরের উদ্দেশ্য সার্থকই হবে। প্রথমে মনে হয়েছিল বোধহয় কিছু কাজ হয়েছে। পরে এ-ধারণা যে ভুল তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের যাওয়ার মাসখানেক পরেই সিংহল সরকার ৮০০ ভারতীয়কে কাজ থেকে বরখাস্ত করেন, তারপর তাদের দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করেন।

সিংহল এবং সিংহলের সব-কিছু আমার খুব ভালো লেগেছিল। কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ওরই মধ্যে সময় ক'রে জওহর একটু-আধটু দেশ দেখে বেড়াত। অপূর্ব সুন্দর সব মন্দির, আর অদ্ভুত সব বাগান দেখলাম, আর সব জায়গাতেই পেলাম প্রচুর আতিথেয়তা। সিংহলী এবং ভারতবর্ষীয়রা রেষারেষি ক'রে আপ্যায়ন আর দাক্ষিণ্যে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত সদাশয় যাদের মনে হল, বিবাদ-বিসম্বাদে এত লিপ্ত থাকতে তারা পারে কী ক'রে।

এখানে পর্দা-প্রথার রেওয়াজ নেই। তবু উৎসব-অনুষ্ঠানে দেখতাম, পৌঁছবার পর মালা দেওয়ার পালা সাঙ্গ হলেই গৃহকর্তা জওহরকে টেনে নিয়ে যেতেন পুরুষদের মধ্যে, আর গৃহকর্ত্রী আমাকে নিয়ে যেতেন মেয়েরা জমেছে যেখানে। শুধু খাবার

সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আবার সকলে এক হতাম; তারপর, কী উপায়ে জানি না, যেন পুরুষরা আর মেয়েরা আগের মতো আবার আলাদা হয়ে যেত।

স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার নিয়ে ভারতবর্ষে কোনো আন্দোলন হয়নি। যে ক'টি নারী সংগঠনের কথা জানি তারা সকলেই শুধু সমাজ-সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত বলা যেতে পারে। পুরুষদের সঙ্গে সমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের মধ্যে আসে জাতীয় আন্দোলন থেকে। অহিংস-আন্দোলনের রীতিই এই যে, এতে মেয়ে-পুরুষের অংশ গ্রহণের সমান অধিকার। গান্ধীজীর মতবাদ নারীদের হৃদয় স্পর্শ করল, বহুযুগের বাধা অতিক্রম ক'রে পথ দেখাল দেশকে সেবা করার। হাজার হাজার মেয়ে গৃহের আবহমান নির্জনবাস ছেড়ে দুঃখ, বিপদ, কারাবাস, এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হল। সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক দু'রকম মুক্তিই এইভাবে অর্জন করলে তারা।

সিংহলে যেখানেই গিয়েছি, হাজার হাজার লোকেরা এসেছে জওহরের কথা শুনতে। তাদের বেশির ভাগই তামিল মেয়ে আর পুরুষ—এখানকার রবার এবং চা বাগানের মজুর। শুধু জওহরকে একটু দেখবার জন্যে তারা পথ চেয়ে থাকত। যখন গাড়িতে যেতাম বা জওহরের সঙ্গে নেমে দাঁড়াতাম, লক্ষ্য করতাম—সেই অগণন জনতার মুখে কী আশা আর আনন্দের উচ্ছ্বাস এই লোকটির জন্যে, যে বহন ক'রে এনেছে মাতৃভূমির বাণী। জওহরের উপস্থিতিতে তারা বুঝলে, দেশকে বহুদিন বহুদূরে ফেলে এলেও, দেশ তাদের ভোলেনি।

সারাদিনের অপরিসীম ক্লান্তির পর জওহর যখন এসে অবসন্ন হয়ে বসত, তখন মাঝে মাঝে মনে হত কি হবে এত খেটে?

কিন্তু যখনই আশায় উজ্জ্বল এই সব মুখ চোখে পড়ত, তখনই মনের সে দ্বন্দ্ব যেত কেটে। এত দরদ, এত ভালোবাসা কষ্ট-করা ব্যাপারটিকে সার্থক ক'রে তোলে।

অসংখ্য সভাসমিতি, অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান, দেশ-দেখা শেষ ক'রে দশদিন অবিরাম পরিশ্রমের পর আমরা ফিরে আসার প্রয়োজন বোধ করলাম—অর্থাৎ জওহর করলে। আমি আরও এক সপ্তাহ থাকবার পর বম্বে ফিরেছিলাম। ফিরেই শুনি জওহর ঠিক করেছে চীন যাবে। ছেলেপিলে নিয়ে রাজা আর আমি এলাহাবাদ গেলাম তার যাত্রার শুভ-কামনা করতে। চীনে যাওয়া জওহরের বহুদিনের স্বপ্ন। প্রাচীন দেশগুলোর প্রতি তার বহুদিনের টান। এতদিনে তার সেই ইচ্ছা সফল হতে চলেছে দেখে আমার আনন্দ হল। অবশ্য যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ফলে তাকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল, বেশিদিন থাকতে পারেনি। চীনাদের এবং তাদের নেতা জেনারিলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার দৃঢ় সংকল্প এবং অদম্য সাহস দেখে মুগ্ধ হয়ে এল জওহর।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আর জার্মানিতে যুদ্ধ বাধল। দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করানো হল। প্রথমে উদ্‌গ্রীব হয়ে আশা করেছিলাম সাম্রাজ্য-বাদের ধ্বংস হবে এইবার, এই ভগ্নস্তূপ থেকে জন্মাবে স্বাধীন, সুন্দর, নতুন ভারত। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সহানুভূতি সম্পূর্ণ ব্রিটেনের দিকেই ছিল এবং তাঁদের সাহায্যের এবং মিত্রতার প্রস্তাবের মধ্যে কোনো কপটতার অবকাশ ছিল না। আমাদের দাবি ছিল শুধু যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা প্রতিশ্রুতি। সে প্রতিশ্রুতি আজও এল, কালও এল। ধীরে ধীরে অগণিত জনগণের

ভুল ভাঙল, ব্যর্থতায় ভরে গেল মন। তারা আশা করেছিল ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ব্রিটেনের মনে একটা পরিবর্তন ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গান্ধীজীর আর গত্যন্তর রইল না। সারা দেশের এটা একটা নৈতিক প্রতিবাদ। গান্ধীজী প্রথম স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করলেন আদর্শ সত্যাগ্রহী বিনোবা ভাবে-কে। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হবার কথা জওহরের। জওহর সত্যাগ্রহ শুরু করবার অনেক আগেই ওয়ার্ধা থেকে এলাহাবাদ ফিরবার পথে গ্রেপ্তার হয়ে একেবারে গোরক্ষপুরে চলে যায় বিচারের জন্যে। বিচারে তার শাস্তি হয় চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড। সারা ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এই মাত্রাহীন শাস্তি শুনে। সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার।

প্রথম যারা স্বেচ্ছায় যোগ দিতে চেয়েছিল রাজা তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু গান্ধীজী জিগগেস করলেন, 'কৃষ্ণা কী বলে? কোনো কারণে তার যদি মত না থাকে, তোমার এবার জেলে যাবার দরকার নেই।' চারদিকের এই বিভ্রাট আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার কর্তব্যটুকু না করতে পেলে রাজা মনে শান্তি পাবে না, এই ভেবে মত দিলাম। রাজা গ্রেপ্তার হবার একমাস পরে আমি নিজে সত্যাগ্রহ করবার জন্যে গান্ধীজীর অনুমতি চেয়ে পাঠালাম। নিজের এই নির্লিপ্ত অবস্থা আর ভালো লাগছিল না। কিন্তু তিনি বললেন, 'তোমার ছেলেপিলেরা সব ছোট; তাদের দেখা শোনা কে করবে? তোমার সত্যাগ্রহ করে কাজ নেই।' কি আর করি, চুপ করেই থাকতে হল।

এর আগে দু-সপ্তাহ—খুব জোর তিন-সপ্তাহ—এর বেশি রাজা

আর আমি কখনও আলাদা থাকিনি। মন বড় খারাপ হয়ে গেল তাকে ছেড়ে। পনেরো দিন অন্তর একবার দেখা করার অনুমতি ছিল, আর নির্দিষ্ট সময়ে একখানা চিঠি। চারদিকে বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না ; তবু বড় একা লাগত অনেক সময়। ছেলেদেরও মনে কষ্ট হত রাজার অভাবে। কিন্তু অতো ছোট হলেও তারা বুঝতে পেরেছিল কি হয়েছে, আর গৌরবান্বিত বোধ করত নিজেদের। দেখা করার পর কোনো-কোনোদিন তারা একটু উতলা হয়ে উঠত সত্যি, দু-এক ফোটা চোখের জল যে না ফেলেছে এমনও নয়। কিছুদিন পর এ-সুবিধেটুকুও কর্তৃপক্ষ বন্ধ ক'রে দেন। এর ফলে ছেলেদের মনে যে বিষম ক্ষোভ এবং তিক্ততা জমে উঠেছিল তা সহজে ভুলবার নয়।

১৪

খাঁটি যে মানুষ তার একার অন্তরের শক্তিকে
পৃথিবীর সাম্রাজ্যের সশস্ত্রবাহিনীও হার
মানাতে পারে না। সেই একটি মানুষই শেষ
পর্যন্ত হবে জয়ী।— টেরেন্স্ ম্যাক্স্‌ইনী

এগারো বছর ধ'রে একমাত্র সন্তান ছিল জওহর, সে-জন্য বাবা এবং মা, বিশেষ ক'রে মা, তাকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছিলেন। সে স্কুলে যেত না। মাষ্টার এসে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। ভাই কিংবা বোন কিছুই না থাকায় সে বড় একলা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আদর দিলেও, বাবার শাসন ছিল কড়া। তাই জওহর নিজের সম্বন্ধে কোনোদিন বেশি সচেতন হতে পারেনি।

ছেলেবেলা থেকে জওহর বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করত। তার কাছে বাবা ছিলেন যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মার্জিত, যা-কিছু শক্তিমান —তার প্রতীক। তার এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বাবার মতো হবার। কিন্তু ভালোবাসলে, শ্রদ্ধা করলে কি হবে, তাঁকে ভয়ও করত খুব! বাবার মেজাজ সম্বন্ধে তার বড় ভীতি ছিল, একবার পরিচয় মিলেছিল সে-মেজাজের। সে-স্মৃতি সহজে মুছবার নয়। তবে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল তার মনে যে, বাবা কখনও অযথা বকবেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাবার রাগ শান্ত হয়ে এসেছিল। মেজাজ তাঁর ছিল চিরকালই, তবে বাবা তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে ফেলেছিলেন। লাজুক, স্পর্শকাতর হয়ে বড় হয়ে উঠছিল জওহর। সমবয়সী সঙ্গীর অভাবে একমাত্র বড়দের সঙ্গেই সে মিশত। চোদ্দ বছর বয়সে সে হ্যারোতে যায় আর পড়াশোনা শেষ ক'রে

১৯১২ খৃষ্টাব্দে সে দেশে ফিরে আসে কেম্‌ব্রিজ থেকে। তখনই আমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা। অপরিচয়ের ব্যবধানেও বহুদিন থেকে তাকে ভালোবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, আবার চটেওছি তার উপর। কয়েকবছর পর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে জওহর যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনীতিতে, তখনই তার সঙ্গে আমার হয় বেশি জানাশোনা। জানবার সঙ্গেসঙ্গেই শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল ভাইয়ের উপর, একদিন ভ্রান্তিবশতঃ যাকে ভেবেছিলাম দাম্ভিক।

বড় ভাই হিসেবে জওহর আদর্শ। আমাদের দুই বোনের চেয়ে সে অনেক বড়, কিন্তু দাদাগিরি কোনোদিন সে ফলায়নি আমাদের উপর। আমাদের কোনো কাজ হয়তো তার পছন্দ হয়নি, কাছে ডেকে এনে বুঝিয়ে, দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের ভুলটা কোথায়, মতে যখন মেলেনি, মনে দুঃখ হলেও সে-দুঃখ চেপে রেখেছে। জোর ক'রে তার মত চাপায়নি। স্বরূপ আর আমার কাছে সে শুধুই শ্রদ্ধেয় বড় ভাই-ই নয়, সে আমাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং চিরকালের সাথী। তার ভালোবাসা এবং সহানুভূতি দিয়ে নিজেকে সে আমাদের কাছে অমূল্য ক'রে রেখেছে। বাবার মতো চিরকালই সে আমাদের কাছে শক্ত খুঁটির মতো। জীবনের সব সমস্যাতে তারই উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়েছি, ক্লান্ত হলে পেয়েছি বল। কখনও সে যেচে উপদেশ দেবার পাত্র নয়। চাইলে সে সাহায্য করতে কার্পণ্য করে না। সমস্ত গোপন, ব্যক্তিগত কথা তার কাছে নির্ভয়ে বলা চলে—ব্যঙ্গের বা বকুনির কোনো আশঙ্কা নেই। নিজে সে সত্যিকারের মানুষ—তাই অপরের দুর্বলতাকে সে কখনও ভুল বোঝে না।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা-কে আর আমাকে নিয়েই জওহর

বিব্রত হয়ে পড়েছিল বেশি। স্বরূপের জন্য কোনো চিন্তা নেই, সে বিয়ে ক'রে নিজের ঘর বেঁধেছে। এখন বাড়ির সে কর্তা হয়েছে ব'লে, ভারতীয় পারিবারিক প্রথানুযায়ী আমাদের কখনও সে বুঝতে দেয়নি যে আমরা তারই উপর নির্ভর ক'রে আছি। মনে আমাদের এ-সব কথার উদ্রেকই হয়নি, কিন্তু তার হয়েছিল। বাবা কোনো উইল ক'রে যাননি, আমরা আশাও করিনি তিনি করবেন, কারণ এ-সব ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবু কোনো না কোনো ব্যাপারে জওহর চিন্তিত হয়ে উঠত। সে ভাবত বাবার আমলে যে-স্বাধীনতা আমরা ভোগ করেছি এখন হয়তো তা করছি না, কিংবা টাকা-পয়সা ব্যাপারে আমাদের হয়তো সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। তাই সে একদিন আমাকে এক চিঠি লিখল যে আমি এবং মা যেন মনে করি, আনন্দ-ভবন এবং যা-কিছু বাবা রেখে গিয়েছেন তার সব-কিছুরই আমরা সত্যিকারের অংশীদার। সে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছে মাত্র এবং সেই হিসেবেই আমরা যেন তাকে দেখি। তার নিজের এবং নিজের পরিবারের প্রয়োজন খুব অল্প। তাই কোনো দ্বিধা না ক'রে আমরা যেন আগের মতোই চলি। সে আছে শুধু প্রয়োজন হলে সাহায্য করবার জন্যে। আমার তো মনে হয় না চট ক'রে এমন ব্যবহার অন্য কোনো ভাই করত। যে জওহর জীবন গড়ে তুলেছে আদর্শ অনুযায়ী, কর্তব্যে যার কোনো দ্বিধা নেই, এ তারই উপযুক্ত কাজ।

জওহরও বাবার মতো রগ-চটা। চোদ্দ বছর যখন আমার বয়েস, একদিন জওহর বললে আমাকে অঙ্ক শেখাবে। অঙ্ক আমার বাঘ, মনে একটুও আনন্দ হল না, কিন্তু এড়াবার উপায়ও নেই। তখনও জওহরকে বেশ ভয় করতাম। কোনো

কারণে আমার উপরে সে চটে—এ চাইতাম না। যাই হোক, প্রথম ক'দিন চমৎকার আমার শেখা চলল।

বড় সুন্দর পড়ায় জওহর। যে-বিষয়ে ভীতি ছিল আমার বেশি, সেইটেই হয়ে উঠল সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। জওহরের সঙ্গে ঐ একটি ঘণ্টার জন্যে আমি রীতিমতো অপেক্ষা ক'রে থাকতাম। যখন মনে একটু বেশ বল পাচ্ছি, আর জওহর-ভীতিও ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি সময়ে একদিন সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। সেদিন কিছুতেই কেমন পড়ায় একেবারে মন দিতে পারছি না, কিছুই মনে থাকছে না—একেবারে যেন বোকা হয়ে গেছি। জওহর বিরক্ত হয়ে চটে উঠতে লাগল। (তাকে দোষ দিতে পারি না!) তাতে আমি ভড়কে গিয়ে আরো বোকা হয়ে গেলাম। এরপরে তার দুই-এক চীৎকারে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেল। দুঃখে হতবুদ্ধি হয়ে শান্তভাবে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসাই সঙ্গত মনে করলাম। সত্যিই, একদিনের পড়া ভুলে যাওয়া এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ নয়। বড় দুঃখ হল মনে। বহু চেষ্টা সত্বেও চোখের জল গোপন করতে পারলাম না। বই গুছোতে-গুছোতে জল ছাপিয়ে উঠল চোখে। সেই চোখের জল দেখে জওহরেরও রাগ এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল। অনুতপ্ত হয়ে সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইল। কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও এরপর আমাকে সে আর কোনোদিন পড়তে বসাতে পারেনি।

যারা জওহরকে ভালো ক'রে জানে না, তারা ভাবে রাষ্ট্রনীতি আর লেখাপড়া ছাড়া তার জীবনে বুঝি আর কোনো আকর্ষণ নেই। এতে তার সময়ের বেশি ভাগটাই কেটে যায় সত্যি। কিন্তু তার অনেক বাতিক, অনেক ভালো-লাগার জিনিস আছে: শুধু

সময় তার যথেষ্ট নেই—এই যা। রাজনীতির কাজ থেকে অবকাশ পেলেই সে বই পড়ে, আবার লেখেও। তবে লেখার কাজটা বেশির ভাগ হয় জেলে! ঘোড়ায় চড়তে সে ভালোবাসে, আর চড়তে জানেও ভালো। সাঁতারও তার কাছে খুব প্রিয় ; তবে সময়ই পায় না সাঁতার কাটবার। জোর ক'রে না ধরলে সে কখনও সিনেমায় বা থিয়েটারে যায় না। কিন্তু বিষয়টা যদি ভালো হয় সে সত্যিই উপভোগ করে। কিন্তু তার সব চেয়ে জমে ভালো ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ছেলেপিলে সে যেমন ভালোবাসে, ছেলেপিলেরাও ভালোবাসে তাকে তেমনি। যত কাজেই সে ব্যস্ত থাক না কেন, যত ক্লান্তই সে হোক না কেন, কোনো বাচ্চা যদি কাছে গিয়ে 'এটা কেন, সেটা কেন' প্রশ্ন করতে শুরু করে, জওহর কখনও তাকে দূর ক'রে তো দেবেই না, বরং সব কাজ বন্ধ ক'রে তার কৌতূহল মেটাতে বসে যাবে।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর ভাগনে-ভাগনীদের নিয়ে যখন সে জমিয়ে বসে, তখন তাকে দেখতে বড় ভালো লাগে। ভাবনা চিন্তা ভুলে সে যেন নিজেও শিশু হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ খেলা ক'রে তাদেরই মতো খুশিতে ভরে ওঠে। জওহর অমন ক'রে আত্মবিস্মৃত হতে পারে, ভুলতে পারে যে সে বড় হয়েছে—তার কারণ জওহরের মনে সত্যিই কোনো কপটতা নেই, সে খাঁটি মানুষ। তাই ছেলেমেয়েদের টান তার প্রতি অত বেশি।

জেলেই থাক আর বাইরেই থাক, ব্যস্তই হোক আর ক্লান্তই হোক, তার একটি নিশ্চিত গুণ যে কখনও সে কোনো বিশেষ উৎসবের খুঁটিনাটি ব্যাপারের কথা ভোলে না। এই সব সতর্ক দৃষ্টির জন্যেই সকলের কাছে সে এত প্রিয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে

অক্টোবর একবার আমার জন্মদিন পড়ল। সেদিনই তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হবার পরেই তার মনে পড়ল আমার জন্মদিনের কথা। দিন কয়েক পরে সে আমাকে লিখল : 'সম্প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আমার ওপর ১৪৪ ধারা জারী ক'রে এবং ১৯শে তারিখে আমায় গ্রেপ্তার ক'রে সেদিনের মস্ত বড় একটা ঘটনার কথা যে ভুলে গিয়েছে তার প্রমাণ দিয়েছে ; তাই যে সুন্দর উপহারটি আমার স্নেহের বোনকে দেব মনে করেছিলাম তা আর দেওয়া হল না। এ একটা মস্ত বড় ত্রুটি হয়ে গেল ! কিন্তু তার সংশোধন ক'রে নিচ্ছি এখনি। আমার ইচ্ছে তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও একটা বইয়ের দোকানে ; পছন্দ ক'রে নাও কয়েকখানা বই যাতে আছে প্রাচীনদের পাণ্ডিত্য, মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস, বর্তমানের নাস্তিকবাদ এবং ভবিষ্যতের প্রদীপ্ত ছবি। মনে ক'রে নাও এই বইগুলি তোমার আন্‌মনা ভাইয়ের স্নেহের উপহার। আন্‌মনা সে সন্দেহ নেই—তবুও মাঝে মাঝে সে তার ছোট্ট বোনের কথা মনে করে। এই বইগুলি প'ড়ে গড়ে তোল তোমার মায়া-পৃথিবী—স্বপ্ন, ফুলের বাগান আর কলধ্বনিমুখর নির্ঝরিণীতে ভরা। সেখানে আছে শুধু সুখ আর সৌন্দর্য ; পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্যের প্রবেশ সেখানে নিষেধ। জীবনে তোমার কাম্য হোক সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় এই মায়া-পৃথিবীটিকে বাস্তবে গড়ে তোলা। এই প্রচেষ্টায় ধুয়ে যাবে জীবনের সব গ্লানি আর কুশ্রীতা।'

বিলেত থেকে জওহর ফিরে এল : মার্জিত, মনোহর এক তরুণ যুবক—একটু বা উন্নাসিক, একটু বা বড়লোকের আদরে-বিগড়ানো ছেলে। তারপরে এল এখানকার জীবনের অভিজ্ঞতা—খানিক হতাশা, খানিকটা দুঃখে ভরা। ফলে তার উগ্রতা হল দূর, স্বভাব

হল স্নিগ্ধ-মধুর। সকলের কাছে সে হয়ে উঠল একান্ত প্রিয়পাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষা তার মনকে বেশ প্রভাবান্বিত করেছে সত্যি। লোকে ভাবে তার ভাবধারা প্রাচীর বদলে যেন প্রতীচীকেই অনুসরণ করে বেশি। সে বেশ খানিকটা যেন ইউরোপীয়। কিন্তু যে যুদ্ধ, অভাব-অনটন এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে জগৎ আজ চলেছে তাতে আমাদের অনেকেরই মতো জওহরও ক্রমশঃই ভারতবর্ষ এবং চীনের অতিত ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে বেশি। আজকে তার ব্যক্তিত্ব এই দেশের প্রাচীন ভিত্তিকেই আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এরই ঐশ্বর্যময় অতীত থেকে প্রাণের রস সে সংগ্রহ করছে অনবরত। অনেক আঘাত এবং অনেক ভুল ভাঙা সত্বেও তার মনে যে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি ও ঔদার্য দেখেছি তা একমাত্র এ-দেশের লোকের পক্ষেই সম্ভব। পূর্ব-পশ্চিম মিশে গিয়েছে তার মনে। প্রাচ্য দেখিয়েছে তাকে জীবনের পথ আর প্রতীচী তাকে বুঝিয়েছে কী মনোবৃত্তির পরিচালনায় মানুষের ভাগ্য কতখানি বিপদগ্রস্ত হতে পারে। তাই তার স্বদেশানুরাগ আজ এই দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে জগতে যদি কোথাও অত্যাচার অবিচার থাকে আমাদের স্বাধীনতার কোনো মানেই হবে না। তার নরম মন এশিয়ার ঘটনাতে যেমন, ইউরোপের ঘটনাতেও তেমনি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধা সে। তাই যখনই হোক না কেন, যেখানেই মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন, জওহর তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রে তা রক্ষা করতে প্রস্তুত।

কেউ কেউ ভাবে জওহর উদ্ধত এবং দাম্ভিক। কখনও কখনও সে বেশ উদ্ধত হয়ে ওঠে সত্যি কিন্তু আসলে সে কোনো দিনই দুর্বিনীত কিম্বা প্রভুত্ব লাভেচ্ছু নয়। খ্যাতি তার কাছে

অনাকাঙ্ক্ষিত। আমার নিশ্চিত ধারণা খ্যাতি কম হলে জীবনে সে শান্তিলাভ করত বেশি। জওহর একটু স্বপ্নবিলাসী—মাঝে মাঝে যখন সে ক্লান্ত দেহটিকে এলিয়ে দিয়ে দূরের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় সে যেন আর এ-জগতে নেই। কখনও আবার দেখেছি তার চোখ হঠাৎ অসম্ভব ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে, তিপ্পান্ন বছর বয়েস হলেও তার যে তরুণ মুখ, সে-মুখে পড়েছে বয়েসের ছাপ। জীবন মসৃণ হয়নি তার কাছে। সমপথবর্তীদের মতো দুঃখ এবং ক্লেশভোগ জওহরের উপরেও তাদের চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

অনেকে জওহরের দোষ ধরেন, তার স্বভাবের সমালোচনা করেন। কিন্তু আসল কথাটা এই: তাঁরা জওহরকে বোঝেন না, তার আচরণ তাঁরা খতিয়ে দেখেন না কখনো। সে আমাদেরই মতো মানুষ, আমাদের অনেকেরই মতো তারও অনেক দুর্বলতা আছে। তবে যেখানে সকলের পরাজয়, তার নয়—এখানেই তার বিশেষত্ব। আজ দেশের কাছে জওহর এত যে প্রিয়—তার কারণ শুধু তার কর্মশক্তি, সাহস আর নানা গুণাবলীই নয়, তার মানুষ-সুলভ দুর্বলতাও বটে। দেশের জন্য একটা মস্ত কাজ করছি কিম্বা কোনো আদর্শের জন্য দিচ্ছি আত্মবলি, এ-ভাব তার মনের মধ্যে নেই। সে মনে করে দরকারের সময় দেশকে সেবা করার সুযোগ সে যে পেয়েছে—এ তার সৌভাগ্য, এই সেবাই সে ক'রে যাবে আজীবন। জেলে যাওয়া একটা বিরাট আত্মত্যাগ বা ঢাক পিটিয়ে বেড়াবার মতো একটা কিছু সে মনে করে না। যদিও জীবনের অর্ধেক তার কেটেছে জেলে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করাটা তার কাছে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অবশ্যকর্তব্য ব্যাপার। জেল থেকে একবার আমাকে

সে লিখেছিল : 'পৃথিবীর ভিত্তি পর্যন্ত আজ কেঁপে উঠেছে—আজকের দিনে জেলে যাওয়া তো তুচ্ছ একটা ব্যাপার। রুটিন হিসেবে এর কিছু মূল্য আছে এবং খানিকটা হিতকারীও হয়তো ; কিন্তু এ-সুযোগও কাজে লাগানো দরকার, তা না হলে এর মূল্য এমন বেশি নয়।...'

তবু বারেবারে জেলে যাওয়া সহজ কথা নয়—জেল এমন আরামের জায়গাও নয় যে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে লোকে বিশ্রাম ক'রে আসবে। কারো আবার ধারণা জেল-যাওয়া একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর তেমন কষ্ট নেই। কয়েক মাস জেলে কাটালেই এ-ধারণা বদলে যাবে সন্দেহ নেই। দৈহিক অসুবিধার কথা ছেড়ে এবং তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই জেলে যেতে হয়। তবে জেলের দৈনন্দিন জীবনে ছোট ছোট যে-সব হীন অবিচারের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, সেগুলোকে সহ্য করাই বড় শক্ত।

প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিচ্ছেদ, কর্তৃপক্ষের খেয়াল মতো তাদের সঙ্গে ক্বচিৎ কদাচিৎ সাক্ষাত—মনকে বড় ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, আর তিক্ত ক'রে তোলে। বহুদিন জেলভোগ ক'রেও মনকে অতিক্ত অবস্থায় রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জওহর এ-পরীক্ষাতেও সগৌরবে উত্তীর্ণ হবার শক্তি রাখে।

জওহর ঠিকই বলেছে। অন্তরে সত্যিকারের প্রেরণা যদি থাকে সিদ্ধিলাভের জন্যে কোনো কষ্টকেই কষ্ট ব'লে মনে হয় না। জওহর যখন বারেবারে জেলে গেছে আমরা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কিন্তু বারেবারেই সে আমাদের অযথা চিন্তা করতে বারণ করেছে, বলেছে : 'ভাগ্যে আমার যাই ঘটুক না কেন ভয় ক'রো না ; মনে ক'রো আমার কিছুই হয়নি।'

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জওহরের চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়! এই দণ্ডের অন্তরালে যে হীন প্রতিশোধের ইঙ্গিত ছিল তাতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কাছেও ব্যাপারটা আশাতীত। সরকারের অদ্ভুত, আশাতীত সমস্ত আচরণে অভ্যস্ত হলেও এই শাস্তিটা অন্যান্য সব শাস্তির তুলনায় বড় তীব্র মনে হল। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে জওহরকে চিঠি না লিখে পারলাম না। চিঠিতে জানতে চেয়েছিলাম আমি আর রাজা দেরাদুনে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কিনা। উত্তরে জওহর লিখেছিল, 'তুমি আর রাজা এলে যে আমি খুব খুশি হব সন্দেহ নেই। বিশেষ ক'রে রাজা'র সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার মনে করি, কারণ অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হবার কোনো আশা নেই মনে হচ্ছে। (রাজা কিছুদিন পরেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে যাচ্ছিল)। শুনে দুঃখিত হলাম রাজা আমার কারাদণ্ডের কথা শুনে মুষড়ে পড়েছে, এমন কি তুমিও। কিছুদিন হল কেমন যেন একটা বিরল শান্তি অনুভব করছি মনে। এই উন্মত্ত পৃথিবীতে এহেন অনুভূতি বিচিত্র সন্দেহ নেই। অবিরাম অভ্যাসের ফলে মনকে আমি সংযত করতে শিখেছি—যা করা হল না তা নিয়ে মন আর বিচলিত হয়ে ওঠে না। আমার জন্যে তোমরা বৃথা চিন্তা ক'রো না। যত দিন যাচ্ছে, জীবন হয়ে উঠছে আরও কঠিন, আরও রূঢ়। অতীতের দিনগুলিতে যেন অতীতেরই একাধিপত্য—তারা আর ফিরে আসবে না! আসবে কী? কখন আসবে?—কেউ জানে না। কিন্তু যা নেই তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে বসে থাকলেও চলবে না; বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। মানসিক কষ্টের তুলনায় দৈহিক কষ্ট নগণ্য। তাই, মসৃণই হোক আর না-ই হোক—সব

সময়েই জীবনের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু আদায় করা যায়। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে হলে মূল্যের কথা ভাবলে চলবে না।'

ছেলেবেলা থেকেই বাবার কাছ থেকে নির্ভীক হতে শিখেছিলাম, বিপদ দেখে কখনো পিছিয়ে যেতে শিখিনি। 'আপন প্রাণ আগে' এ-আদর্শে আমরা কখনই অনুপ্রাণিত হইনি, আমাদের সন্তান-সন্ততিরাও না। অনেকবারই আমাদের প্রত্যেককে একা এমন অনেক কাজ করতে হয়েছে, কি এমন অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, যেখানে বিপদ মনে হয়েছে অবশ্যম্ভাবী; তবু সে-কাজ অকৃত অবস্থায় কখনও পড়ে থাকেনি। জওহরের কাছে কোনো কাজে কিছু বিপদের সম্ভাবনা তো অতিরিক্ত একটা আকর্ষণ। সময়ে সময়ে এর ফলে কতগুলো কাজ ছেলেমানুষী ব'লে মনে হয় সত্যি, তবু সারাজীবন ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করার চাইতে এ-মনোভাব বাঞ্ছনীয়।

একবার জওহর কলকাতায় আলিপুর জেলে বন্দী হয়েছিল! গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে কোনো চিঠি না-পাওয়ায় আমরা বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এল একটা জওহর-সুলভ চিঠি: 'স্নেহের কৃষ্ণা, আশা করি তোমরা আমার জন্য উদ্বিগ্ন হওনি। আমি খাসা আছি। মনে করছি, এবার অনেক বই পড়ব। প্রাত্যহিক কাজ হিসেবে এক পড়াশোনা এবং চিন্তা করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই এখানে করবার নেই। কিছু-দিন পর যখন বেরিয়ে আসব তখন জ্ঞানের মাত্রাটা একটু বেড়ে যাবে হয়তো। হয়তো বলছি এই জন্যে যে জ্ঞান জিনিসটি নাগালের মধ্যে আনা শক্ত। কখনও আবার এমনি এসে পড়ে। ইতিমধ্যে আমি অবিশ্যি তার আরাধনা ক'রে যাব। দেবী

একদিন হঠাৎ প্রসন্না হতে পারেন। তাঁকে আরাধনা করার জন্যে জেল মোটেও অনুপযুক্ত জায়গা নয়। জীবনের কলরোল এখান থেকে বহু দূর, মনকে বিক্ষিপ্ত করে না। দূর থেকে অনাসক্ত দৃষ্টিতে সকলের জীবন দর্শন— এ-ব্যবস্থা মাঝে মাঝে মন্দ নয়।'

উপভোগ করবার সুযোগ কম হলেও বাড়ির বাইরের জীবন জওহরের কাছে একান্ত প্রিয়। আমরা যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম, সারা শীতকালটা সে স্কেটিং ক'রে, বরফের উপর নানা রকম খেলাধূলায় কী আনন্দেই না কাটিয়েছে। প্রকৃতির অম্লান, সজীব সৌন্দর্য তাকে আকর্ষণ করে। জওহর প্রকৃতির সরল সন্তান।

জওহর চায় সব কাজই মানুষ ভালো ক'রে করুক—সে খেলাই হোক আর আসল কাজই হোক। কাজে ফাঁকি দেবার উপায় তার কাছে নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ছ'মাস তার সেক্রেটারির কাজ ক'রে আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি—কখন কি ভুল ক'রে বসি আর জওহর যদি চটে ওঠে। আমার ভাগ্য ভালো ব'লেই হোক অথবা সামর্থ্য ছিল ব'লেই হোক, সেক্রেটারিগিরি করতে গিয়ে তার কাছে বকুনি কোনদিন খেতে হয়নি। কুঁড়েমি কি অপটুতা জওহরের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। সুইজারল্যাণ্ডে একবার সে আমাকে 'শি' করা শেখাতে চাইল। দু'দিন বরফ পড়েনি। আগে যা পড়েছে তা জমে শক্ত পেছল হয়ে গিয়েছিল। যতবার 'শি' পায়ে দিয়ে দাঁড়াতে যাই খালি প'ড়ে যাই, আর জওহরও তত বিরক্ত হয়ে ওঠে। কিছুতেই টাল সামলাতে পারি না। জওহর মনে ক'রে আমি ভয় পাচ্ছি, তাই আরও বিরক্ত হয়ে

ওঠে। বেপরোয়া হয়ে দু'এক পা এগুতে গিয়ে আছাড় খেলাম— পড়াটাও তেমন শোভন হল না। বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে জওহর বলল, 'শি-করা তুমি জন্মেও শিখতে পারবে না।' মনে মনে দুঃখিত হয়ে এক সুইস্ বন্ধুর কাছ থেকে কায়দাটা আয়ত্ত ক'রে নিলাম। তিনদিনের মধ্যে আমি নিজে নিজে 'শি' ক'রে তাকে অবাক ক'রে দিলাম। জওহরের কথা থাকল না।

কারো অসুখ হলে জওহরের সেবা-শুশ্রূষা দেখবার মতো। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জওহরের ধৈর্য এবং সহানুভূতি শুধু অসীম নয়, স্নিগ্ধ। তার সবচেয়ে বড় গুণ—যে অবস্থার মধ্যেই সে পড়ুক না কেন, তার সঙ্গে নিজেকে সে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যত নগণ্য পারিপার্শ্বিকই হোক না কেন, সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব সে কখনই বোধ করে না। দেরাদুন জেল থেকে একবার সে আমাকে লিখেছিল, 'বিকেলের প্রখর সূর্য, এক পাহাড়ের মাথায় ছাড়া, প্রায় সমস্ত বরফই গলিয়ে ফেলেছে। মেঘ গিয়েছে কেটে; অদ্ভুত সুন্দর নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছি। উত্তর ভারতে বৃষ্টির পরে যে-রকম নীল আকাশ। তোমাদের বম্বেতে আকাশ এ-রকম নীল হয় নাকি? হয়তো হয়, তবে কারো বোধ হয় দেখবার অবকাশ হয় না। আজকের সন্ধ্যাটা ছিল অপূর্ব সুন্দর। মেঘেরা মেতেছিল খেলায়, সূর্যের রঙীন রশ্মি এরা এলোমেলো ছড়িয়ে দিচ্ছিল আকাশে; অদ্ভুত সব রঙ এসে আবার মিলিয়ে গেল; কত বিচিত্র সব মূর্তি ভেসে উঠল, আবার মিশে গেল; অবর্ণনীয় সেই রঙের মাতামাতি। পাহাড়ের মাথাগুলি জ্ব'লে উঠল লাল হয়ে; খাইবার শৈলশ্রেণীর কথা মনে পড়ে যায়। এখানে ওখানে ছোটো ছোটো তুষারস্তূপে ক্ষণিকের জন্য লাগল রঙের ছোঁয়া।

একটু পরেই উঠে এল চাঁদ, প্রায় পূর্ণ চাঁদ ; বৈচিত্র্য গেল বেড়ে।'

আপাতদৃষ্টিতে সুখী, হাসিখুশি মনে হলেও জওহর তার জীবনে দুঃখ পেয়েছে সাধারণ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি। যে-সময়ে স্ত্রীর প্রেম ও সাহচর্য তার বেশি প্রয়োজন, সে-সময়েই সে অকালে হারাল স্ত্রীকে। বাইরে বোঝা গেল না বটে তার শোকের গভীরতা। কিছুক্ষণের জন্যে অভিভূত হলেও, প্রায় নিমেষেই সে ফিরিয়ে আনতে পারে নিজের শান্ত স্থৈর্য, এমনি তার আত্মসংযম। অত্যন্ত অল্প বয়সে জওহর রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন সে বুঝতে পারেনি এ-ই হবে তার জীবনের ব্রত। ধীরে ধীরে ঘটনার প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তবু কোনো অনুতাপ নেই তার মনে। অতীতের প্রারম্ভে ফিরে যাওয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব হতো আবার সে এমনি ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়ত এই কাজে। কোনো কোনো কাজ হয়তো সে অন্য ধরনে করত, এই যা। অনেকে তাকে ভাবে খেয়ালী, বলে স্বপ্ন-বিলাসী, বলে হাতের কাজ ফেলে রেখে সে বড় বড় বক্তৃতা দেয়। এ-সব অভিযোগের সত্য-মিথ্যা আমি জানিনে। তবে এটুকু জানি : স্বপ্ন সে দেখে সত্যি—বিরাট এক স্বপ্ন! স্বপ্ন সে দেখে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার। যদি অকৃতকার্য হয় নিজে, আর কেউ সফল করবে সেই স্বপ্ন। তার স্বপ্নের কেন্দ্র কখনই সে নিজে নয়—কেন্দ্র হল ভারতবর্ষ। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়েই তার স্বপ্নজাল ; ভবিষ্যতে এই দেশ যে গৌরবাসনের সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হবে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র তার সন্দেহ নেই। প্রয়োজন হলে সেই ভারতের সেবায় সে সানন্দে প্রাণ দেবে।

১৫

প্রেতের মতন আমি শৈশবের স্মৃতি-তীর্থে বেড়োলাম ঘুরে
মনে হ'ল ধন্য যেন অন্তহীন মরু—
প্রিয় যারা তাহাদের দেখা পেতে যেতে হবে পার হয়ে
বহু বহুদূরে,
কেউ তারা ছেড়ে গেছে, জীবনের পরপারে কেউ,
কেড়ে নিয়ে গেছে আরো কোনো কোনো জনে,
বিগত সবাই
পুরাতন পরিচিত মুখ গিয়েছে হারিয়ে।—চার্লস ল্যাম্ব্

বছর খানেক আগে আমার দুই ছেলে হর্ষ আর অজিতকে নিয়ে এলাহাবাদ যাচ্ছিলাম। রাজা সঙ্গে আসতে পারেনি, পরে আসবে। যাচ্ছি ইন্দিরার বিয়েতে। পরিচিত দীর্ঘ পথের যেখানে যা-কিছু প্রায় সবই মুখস্থ। এই সাড়ে নয় বছরে অসংখ্য বার যাতায়াত করেছি এই পথে, তবু প্রতিবারই যাবার সময় কেমন যেন একটু খটকা লাগে—মনে হয় গিয়ে কি সব শুনব কে জানে। প্রতিবারই একটা না একটা অশান্তি ঘটেছেই; হয় মায়ের হঠাৎ অসুখ, নয় জওহর গ্রেপ্তার হল—নয় এমন আর কিছু। কিন্তু এবারে যাওয়ার কারণ আনন্দের, তাই আশা করছি এবারের যাওয়া আনন্দেরই হবে। এবার আমার পরম স্নেহের ভাইঝি ইন্দিরার বিয়ে।

গভীর রাতে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছনো গেল। বাড়ির গাড়ি এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। মিনিট পনেরো পরে দূর থেকে চোখে পড়ল আনন্দ-ভবন; প্রিয়, পরিচিত আনন্দ-ভবন! এত

রাতেও আলোয় সে উজ্জ্বল—কর্মকোলাহলমুখর। কত লোকের এদিক-ওদিক আনাগোনা। প্রতি ঘর থেকেই হর্ষধ্বনি আসছে। বহুদিন পর আবার আনন্দ এসেছে আনন্দ-ভবনে। বৃহৎ তোরণ পার হয়ে গাড়ি প্রবেশপথের কাছে আসতেই ছেলেপিলের কথা ভুলে গিয়ে লাফিয়ে পড়লাম জওহরকে খুঁজে বের করবার জন্যে! দু-এক পা সবে এগিয়েছি, কোন একটা ঘর থেকে হঠাৎ সে বেরিয়ে এল, এসে আমায়, আমার ছেলেদের গভীর আলিঙ্গন করলে। সেই পুরনো পরিবেশ, ভাই আর বোনেরা—মনটা ভ'রে উঠল। প্রতিবারই আনন্দ-ভবনে যখন এসেছি, মন নেচে উঠেছে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পর মুহূর্তেই বুঝেছি এ-বাড়ি আর সে-বাড়ি নেই, নেই সেই প্রিয়জনেরা; চলেছে আকস্মিক পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। জল চোখের প্রান্ত পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। কিন্তু এবার কোনোরকম আর দুঃখ নয়, এবার আনন্দ-উৎসব, আনন্দে থাকতে হবে।

এই সেদিনকার সুখশান্তিপূর্ণ বাড়ি—কালের রূঢ় আঘাতে আজ ম্রিয়মান। তবু এখানে ফিরে এলে আবার যেন আমার আঠারো বছরের জীবন ফিরে পাই। ভাইয়ের স্নেহ আর বোনের মমতায় মনে পড়ে যায় সেই দায়িত্বহীন দিনগুলি! এই যে অনুভূতি—এই অনুভূতির জন্যই এত ভালো লাগে এই বাড়ি ফিরে আসা।

বিয়ের সকাল হল—সুন্দর, উজ্জ্বল। উৎসব যাতে ত্রুটিহীন হয় তার জন্যে অত সকাল থেকেই সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খুড়তুত, মামাত বোনেরা, বন্ধুবান্ধবেরা—তাদের যা রীতি—কনের ঘরে গিয়ে ঠাট্টা তামাশায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। খদ্দরের একখানা শাড়িতে ইন্দিরা সেজেছে—শুভ্র, সূক্ষ্ম খদ্দর; জেলে ব'সে জওহরের নিজ হাতে কেটে বোনা। চারদিকে

ভিড় ক'রে লোক। উপহারের পর উপহার আসছে। লজ্জানত ইন্দিরা, একটু বা চঞ্চল; তবু ভাবখানা তার প্রশান্ত। এমনিই ইন্দিরা সুন্দরী, এখন তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর— পেলব সৌকুমার্যে প্রদীপ্ত। সে হাসছে, আলাপ করছে সবার সঙ্গে। তবু তার আয়ত কালো চোখে মাঝেমাঝে যেন এক বিষন্নতা ফুটে উঠছে। আজকের এই দিনে কেন বিষাদ ওর চোখে? ওর মনে পড়েছে কি ওর অকাল-মৃতা মায়ের কথা? তাই যদি হয়, সে-শূন্যতা তো আজকেও পূর্ণ হবার নয়! না, ওর মনে পড়ছে ওর বাবার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা! জওহরের সে প্রাণপ্রতিম। তার অনুপস্থিতিতে জওহরের নির্জন জীবন শূন্যতর হয়ে উঠবে। হয়তো পুরনো বাঁধন ভেঙে নতুন জীবনের সূচনায় তার চোখে বিষাদ ঘনিয়ে এসেছে। কে জানে কি আসবে সে-জীবনে—সুখ না দুঃখ; পূর্ণতা না হতাশা! তার কালো চোখ সাময়িক ভাবে আরও কালো হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল; দৃষ্টি হয়ে উঠল গভীরতর।

শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হতেই জওহর ইন্দিরাকে নিয়ে এল বিবাহ-মণ্ডপে। পাত্র সেখানে অপেক্ষমান। অনুষ্ঠানে কোনো আড়ম্বর ছিল না। বরকনে পাশাপাশি বসল; কনের বাবা বসল সামনে; পাশে শূন্য একখানি আসন। যার কথা আজ বারেবারেই জওহরের মনে পড়ছিল সেই কমলার জন্যে ঐ শূন্য আসনখানি! সেই করুণ শূন্য আসনখানির দিকে তাকিয়ে আমার গলা ভারাক্রান্ত হয়ে এল। ভাবতে লাগলাম কমলার কথা। আজ সে থাকলে কত সুখীই না হত! তার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল—আনন্দে কমলা যেন উপছে পড়ছে! কনে বড় কি মা বড় দেখে চট ক'রে বোঝা যায় না।… এ-সব চিন্তা জোর

ক'রে মন থেকে দূর ক'রে দিলাম। এ-সব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষা নেই ; দিনটাকে একেবারে মাটি ক'রে দেবে। কয়েকদিন ধরে যথারীতি চলল আনন্দ-উৎসব। পুরনো বাড়ি হয়ে উঠল উল্লাস-চঞ্চল। তারপর, একে একে বিদায় নিতে আরম্ভ করল অতিথিরা। আমিও ফিরে এলাম বম্বে।

এক বছর পর। আবার চলেছি এলাহাবাদের পথে। নয়মাস কারাবাসের পর পনেরো দিনের অবকাশে স্বরূপ বেরিয়ে এসেছে ; চলেছি তার সঙ্গে সপ্তাহ খানেক কাটাবার জন্যে। পরিচিত স্টেশনে যখন পৌঁছুলাম তখন অনেক রাত। এবার যেন বেশ একটু প্রাচীন দেখাচ্ছে স্টেশনটাকে। এক বন্ধু আর এক তরুণী ভগ্নী এসেছিল আমাকে নিতে। সবাই মিলে রওনা হলাম—বাড়ির গাড়িতে নয়, টাঙায়। গাড়ি এখন আর নেই আমাদের। পুরনো টাঙা—অসমান খারাপ রাস্তা দিয়ে যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলল।

আনন্দ-ভবনে ঢুকলাম। এক বছর আগের সেই বাড়ি আর আজকের এই বাড়ি! না আছে উজ্জ্বল আলো, না আছে চাকর বাকরদের হুড়োহুড়ি। প্রায়ান্ধকার বাড়ি, প্রবেশ পথে ক্ষীণ একটি আলো আর এক ঘরের মধ্যে আরেকটি। যেন বিষন্ন, নিস্তব্ধ, পরিত্যক্ত এক পুরী। কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ে মনটা যেন দ'মে গেল ; মনে হল কোন অপরিচিত এক পথ দিয়ে যেন চলেছি ; মোড় ঘুরলেই কি না জানি দেখব। টাঙা থেকে নেমে শশঙ্কিত মনে চললাম স্বরূপের খোঁজে। ঘরে ঢুকতেই সে উঠে আমায় আলিঙ্গন করলে। এ কী চেহারা হয়েছে স্বরূপের! পাছে এই ব্যথিত বিস্ময় আমার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে, তাই দুই হাতে তাকে জড়িয়ে মুখ লুকোলাম। মাত্র এক বছর আগে

তাকে দেখেছি—তখন তার বয়েস যেন বছর দশেক কম ছিল। ন'মাস জেল ভোগের পর এই কয়েকদিনের জন্যে মুক্তি পেয়েছে। কারাগার আরেকজন প্রিয়পাত্রীর উপর তার নির্মম ছাপ দিয়ে গেল —মাত্র কয়েক মাসে অনেক বয়েস বাড়িয়ে দিয়ে গেল স্বরূপের।

এক সপ্তাহ পরে ফিরে এলাম আমার ছেলেদের কাছে, কিন্তু জীবন আপন-জনহীন। স্বরূপকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আবার জেলে ফিরে যেতে হবে। তার তিন মেয়ে পড়ে থাকবে বাইরে। আশা-ভরসার বদলে তিক্ততা, ব্যর্থতায় ভরা জগতে যেমন ক'রে পারে নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নেবে।

বম্বের পথে ট্রেনে ব'সে ভাবছিলাম আবার যখন আনন্দ-ভবনে আসব তখন না জানি কি নতুন পরিবর্তন দেখব সেখানে! হাসিখুশি, লোকজনে আবার কী ভরে যাবে না এই শূন্য নিরানন্দ বাড়ি? প্রার্থনা জনালাম নীরবে: 'আনন্দ-ভবন কখনো নিরানন্দ যেন না হয়। বাবা যে এর নামকরণ করেছিলেন তা যেন না ব্যর্থ হয়, ভগবান।' মনে গ্লানি নিয়ে ফিরে এলাম আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটে। আমার বাড়িও জনহীন রাজার অভাবে। জীবন অবশ্যি কেটে যাবেই। জওহরের সঙ্গে আরও কত হাজার হাজার কর্মী জেলে—তাদের অভাবে যদিও জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে। গত চার বছর ধরে চলেছে যুদ্ধ, সমস্ত মানবকুল জড়িয়ে পড়েছে এই যুদ্ধে। স্বাধীনতা তো মিললই না, উপরন্তু সামান্য সম্মতিরও অপেক্ষা না ক'রে, জোর ক'রে আমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে যুদ্ধের এই তপ্ত কটাহে। শুনেছি এ-যুদ্ধ না কি বিশ্বমানবের 'শান্তি আর স্বাধীনতার জন্যে। তবু এই চার বছর ধ'রে প্রতিপদে আমাদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয়েছে; এমন কি আমাদের নেতাদের পরিচালনায় আমরা

যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করব—তার পথ পর্যন্ত খোলা রাখা হয়নি। দেশবাসী মিত্রশক্তিদের প্রতি সহানুভূতি আর সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা—এই দোটানার মধ্যে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে বসেছিল। তাই আমরা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দাবী করেছিলাম, যে-উদ্দেশ্যে সকলের স্বাধীনতার সমান অধিকার স্বীকৃত হবে। কিন্তু কোনো উত্তরই এল না আমাদের আবেদনের। অনেক দ্বিধার পর, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধ শেষ হবার পরে স্বাধীনতা দেবার এক প্রতিশ্রুতি এমন সব সর্তে আমাদের দেয়া হল, যে-সব সর্ত জগতে কোনো জাতির পক্ষেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই রকম প্রতিশ্রুতি নতুন নয়, অতীতে অনেকবারই পাওয়া গিয়েছে, একবারও পালিত হতে দেখা যায়নি। যে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া হয়নি, কোনোদিন হবে না—তার জন্যে আমাদের রক্তদানের, ক্লেশভোগের কথা—বিরাট এক হীন ব্যঙ্গ ছাড়া আর কি!

আজকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা দাবী করছি নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার। শুধু এ-দেশেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান আমাদের উদ্দেশ্য নয়—জগতে যেখানেই এর স্থিতি, আমরা চাই এর অবসান। আমাদের স্বাধীনতার দাবী সারা জগৎ-বাসীর বিদেশী শোষণের হাত থেকে মুক্তিলাভেচ্ছার প্রতীক। ব্রিটেনের কাছে তার যুদ্ধোদ্দেশ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবী জানিয়ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হয়। সারা জগৎবাসীর বিবেকের কাছে এই সত্যাগ্রহ ছিল একটা আবেদন—কিন্তু বৃথাই। আমাদের আবেদনের গুরুত্ব আরও বাড়াবার প্রয়োজন

হল, যার জন্য আরো আত্মত্যাগ হল অবশ্যম্ভাবী। প্রতি সীমান্তে আমাদের আসন্ন সঙ্কট। তবু কংগ্রেস জনসাধারণকে আরও স্বার্থত্যাগের জন্যে আহ্বান না ক'রে পারল না, কারণ বিশ্বের শান্তি, আর স্বাধীনতাই আজ শঙ্কটাপন্ন নয়, স্বদেশকেও ফ্যাসিস্টদের কলুষিত হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তাই শুরু করা হল বর্তমান আন্দোলন। শুরু ঠিক বলা চলে না কারণ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ হবার অনেক আগেই নেতারা সব গ্রেপ্তার হলেন। আজ আমাদের যে এই সংগ্রাম তা শুধু একা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নয়, সে-রকম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রকাশ এ নয়। এ হল জনসাধারণের আরও সত্য, আরও উদার স্বাধীনতার প্রেরণা। ভারতবর্ষ চিরকালই ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে; নিজেদের ক্ষীণ হাত চীন, স্পেন এবং অন্যান্য দেশের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে সহায়তায়। যেখানে অর্থ বা পণ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি, সেখানে পদ-দলিত জনসমাজের জন্যে বার বার জানিয়েছে সহানুভূতি।

আমাদের তথা সমস্ত পৃথিবীর আজ লক্ষ্য হচ্ছে কি ক'রে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমূল একটা পরিবর্তন আনা যায়। তবেই জাগ্রত হবে আমাদের জনশক্তি, জাপানীর আক্রমণকে রুখতে পারবে, এই ভারতবর্ষকে ক্ষয়, এবং অবনতির পথ থেকে পরিচালিত করতে পারবে উন্নতির পথে। আজকের এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে যেটুকু শান্তি এবং শৃঙ্খলা আনা সম্ভব তা আমাদেরই আনতে হবে। সে-তুলনায় ভারতবাসীর ক্ষমতা হয়তো খুবই অল্প। তবু আদর্শ যদি থাকে অটুট, আর

আলো যদি রাখা যায় উজ্জ্বল, একদিন কেউ না কেউ এই আশা নিশ্চয়ই সফল করবে। পথে বাধাবিঘ্ন হয়তো আসবে অনেক, তবে পথ যদি আমাদের ঠিক থাকে, আর লক্ষ্য যদি থাকে স্থির ও দৃঢ়—এ-বাধাবিঘ্ন আমরা অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারব। জগতের অসংখ্য জনমানবের, বিশেষ ক'রে আমাদের, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত আর শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই; তার জন্য যত দামই দিতে হোক না কেন। এর জন্যে সারা জীবন শুধু দুঃখ সইতে হলেও এই কাজেই আমরা আত্মসমর্পণ ক'রে যাব। সুখ আমাদের জীবনে না এলেও আমাদের বংশধরেরা এর জন্যে স্বাধীন হয়ে সুখে থাকবে। পিয়ের ভ্যান্ পাসেন তাঁর 'দ্যাট ডে অ্যালোন' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'এমন একদিন আসবেই যখন একা-পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়বে পথিক, তখন সে তার সহযাত্রীর দিকে নিশ্চয় ফিরে তাকাবে। যেদিন আমরা অপরের আনন্দ বিষাদ, আশা আর ক্লেশ নিজের ব'লে নিতে শিখব, সেদিনই প্রেমের আর ন্যায়ের শৃঙ্খলা আসবে জগতে। সেই বিশ্ববিধানের জন্যেই সারা বিশ্ব আজ ব্যাকুল···।'

জন্মাবার পর থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবন কেটেছিল অবাধ সুখ আর শান্তিতে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই প্রথমে আমার শান্ত জীবনে তরঙ্গ তুলে দিল। যা কোনোদিন ভাবিনি তাই ভাবতে শুরু করলাম। এই প্রথম আলোড়নের পর অনেক ঢেউ আসতে আরম্ভ করল একটার পর একটা—প্রত্যেকটাই আগের চেয়ে বড়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে জীবনের স্বাভাবিক গতি আমাদের সকলেরই ভেঙে গেল; তবু পারিবারিক বাঁধন রইল টিঁকে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বাবার মৃত্যু আমাদের জীবনে শুধু একটা বিরাট শূন্যতারই সৃষ্টি করল না, দুর্ভাগ্যের শুরুও হল

এই থেকে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কমলা মারা গেল; তার দু' বছর পরেই মা। আর্থিক অবস্থাও তখন আমাদের ভালো নয়। কারও জীবনে সুখ শান্তি তেমন না থাকলেও, আমার মনে হয়, আমাদের পরে যারা এসেছে তাদের কপালেই কষ্ট জুটেছিল বেশি। ক্রমান্বয়ে বিচ্ছেদ আর ছোটবড় দুর্ভাগ্যের নানারকম আঘাত আমি আর সইতে পারছিলাম না, প্রায় হতাশই হয়ে পড়েছিলাম। সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে আমাদের এই সংগ্রাম —এই বিশ্বাসই আজ পর্যন্ত আঁকড়ে ধ'রে আছি, এতেই আমাদের একমাত্র আশা। এ-সংগ্রাম আমাদের একলার নয়, সারা বিশ্বের এ-সংগ্রাম। এই বিশ্বাস শুধু আমাকেই নয়, আমার মতো আরও অনেককে প্রচণ্ড দুঃখ আর বেদনা নীরবে সহ্য করবার শক্তি দিচ্ছে নিয়ত, অবসাদের অবকাশ আসতে দিচ্ছে না মনে।

ভারতের বহু দেশবাসীর পাশাপাশি আমি এবং আমার পরিবার এই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন ক'রে চলেছি বছরের পর বছর। এই অনিশ্চয়তায় মাঝে মাঝে দেহ মন ভেঙে যে একটু না পড়ে এমন নয়। এই আশায় পথ চেয়ে বসে আছি— স্বাভাবিক সুন্দর জীবন আবার ফিরে আসবে, ফিরে আসবে দেশে শান্তি আর সম্পদ, আমরাও আবার সকলে মিলিত হব। কিন্তু সে-ভবিষ্যত যে অদূর আর উজ্জ্বল এমন ভরসা পাচ্ছিনে। কখনো ভাবিনি এ-ধরনের জীবন আমাকে কাটাতে হবে, উত্তীর্ণ হতে হবে এত পরীক্ষায়, এত ক্লেশ, এত অশান্তি হবে আমার নিত্য-সহচর। তবু, এ-সব সত্ত্বেও, অতীতের দিকে যখনই ফিরে তাকাই, সত্যি ক'রে বলতে পারি—কোনো খেদ নাই।

'কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্তসৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কী বলে তারা ; তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের 'পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।'

রবীন্দ্রনাথ

দুই বোন

'দুই বোন' ও 'স্মৃতিগুচ্ছ'তে যা বলতে চেয়েছিলাম তাই পরে বড় ক'রে বলেছি 'কোনো খেদ নাই'-তে। বইয়ের এখানেই শেষ কিন্তু তার বক্তব্য যা, তা এখনো এগিয়ে চলেছে। ঐ দুটি লেখাও এখানে যোগ করেছি কারণ এমন সব স্মৃতিকে ওরা বহন করছে যা, ফিরে ফিরে আমার মনের দরজায় আঘাত দেবে চিরকাল।

মায়ের খাটের পা ঘেঁষে যে মেয়েটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বয়স বছর দশেকের বেশি হবে না। আশ্চর্য হয়ে সে তাকিয়েছিল খাটের ভিতরে শোয়া নতুন অতিথিটির দিকে। তার এক ছোট বোন এসেছে—কী ছোট্ট, অথচ কি নিখুঁত। কোত্থেকে বোন এল, কেমন ক'রে এল—বোকার মতো এ-রকম নানান প্রশ্ন ক'রে সে সবাইকে অস্থির ক'রে তোলেনি, কারণ বয়েসের হিসেবে বুদ্ধিটা তার কিছু বেশিই ছিল। যা অস্পষ্ট ধারণা ছিল তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে সে এই আজব চিজটিকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল, ভাবছিলো একদিন তার নিজেরও যদি এমন সুন্দর একটা বাচ্চা হয় কেমন তাকে নিয়ে খেলা করা যাবে! খুশিতে তার মনটা ভরে গেল, ঐ ছোট্ট প্রাণীটির প্রতি তার ভারি একটা স্নেহের ভাব এল, যেন দুই হাতে জড়িয়ে ও তাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে চায়, যেন ওর ভালোবাসাটা কেবল বোনের ভালোবাসা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি।

এর পরে অনেকদিন কেটে গেছে। বাড়িতে বিরাট উৎসব, চারদিক যেন খুশিতে উপচে পড়ছে। বিরাট বাড়ি সাজসজ্জায়

রঙিন হয়ে উঠেছে, ভিতর থেকে ভেসে আসছে গান আর হাসির শব্দ। বাড়ির ছোট মেয়ের আজ বিয়ে। বয়স তার কুড়ি বছরও নয়, চুপচাপ ক'রে একটি ঘরে সে বসেছিল, হাল্‌কা গোলাপী শাড়িটি পরে তাকে দেখাচ্ছিল যেন ভোরের আলোর চেয়েও মিষ্টি। তার জীবনে যে কতো বড় একটা ব্যাপার ঘটতে চলছে তা সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। পাশেই বসেছিল তার বড় বোন। তারও বয়স অল্প, আর ভারি সুন্দর দেখতে। কিন্তু পরনে শাদা শাড়ি, গায়ে নেই একখানি গয়না। সে বালবিধবা। তারও বিয়ে হয়েছিল কুড়িতে পড়ার আগেই, স্বামীকে ভালো ক'রে চিনতে না চিনতে এক বছরের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। কিন্তু আজকের দিনে তাঁর মনে কোনো ব্যক্তিগত দুঃখের চিহ্ন ছিল না। যে ছোট বোনকে সে প্রায় নিজের হাতেই মানুষ করেছে আজ তার বিয়ে, আজ শুধু আনন্দ। সারাজীবন তার সবটুকু ভালোবাসা সে উজাড় করে দিয়েছিল তার এই ছোট বোনটিকে। নিজের জন্য তার কিছুই চাইবার ছিল না—জমকালো জামাকাপড় না, হীরে-মুক্তো না, কোনো আড়ম্বর না। চিরকাল, বিশেষ ক'রে আজ, তার একমাত্র কামনা এই যে তার বোনের জীবনে যেন কণামাত্র অমঙ্গলের স্পর্শটুকু না লাগে। ছোট্ট কনেটির পাশে ব'সে করুণ চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, আর বোনের সৌন্দর্য দেখে গর্বে ভরে উঠছিল তার বুক।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ছোট্ট বোনটি আর ছোট্ট রইল না, এখন সে সুন্দরী পূর্ণবয়স্কা মহিলাতে পরিণত হয়েছে, অনেক ছেলেমেয়ের মা সে, সুখী, ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবারের কর্ত্রী সে। এইভাবে সুখে শান্তিতে বছরের পর বছর কেটে গেল।

তারপর একদিন এই বিরাট বাড়িতে এল দিন-বদলের পালা।

বাড়ির কর্তা মারা গেলেন। গৃহিণীর মুখ শান্ত, বিষণ্ণ, যেন তিনি বড় একা। যে-বাড়ি এতদিন খুশির শোরগোলে মাতোয়ারা ছিল, এখন সে নীরব, ম্রিয়মাণ। বাড়ির যিনি প্রাণ ছিলেন তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হাসি আর আনন্দ যেন বিদায় নিয়েছে।

বাগানের এক কোণে দুটি মহিলা বসেছিলেন—তাঁদের বয়স হয়েছে, তবু যৌবনের সৌন্দর্য না গিয়ে সে-বয়েস যেন আরো আশ্চর্য এক আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। দু'জনের মধ্যে বড় যিনি, তাঁকেই কিন্তু এখনো বেশি সুস্থসবল দেখায়। মাথার চুলে এখনো ভালো ক'রে পাক ধরেনি, করুণ মুখ এক অপার্থিব আভায় উজ্জ্বল। ছোট বোন এখনও সেই ছোটখাট দেখতে, পালকের মতো যেন হাল্‌কা আর নরম। বরফের মতো শাদা চুল শোকতপ্ত করুণ মুখের চারপাশ ঘিরে একটা আলোর বৃত্ত রচনা করেছে। দূর থেকে বাতাসে নাতিনাতনীদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে আর তাই শুনে এক একবার বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠছে এই দুই বৃদ্ধার মুখে।

ছোট বোনের শয্যার কাছে দাঁড়িয়ে পাথরের মূর্তির মতো তিনি চেয়ে রইলেন। যেমন বেঁচে থাকতে তেমনি মৃত্যুর পরও তাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। কিন্তু তিনিই তো বড়, তাঁরই তো জীবনের কাজ আগে ফুরিয়েছে, তবে তাঁকে একা ফেলে রেখে কেন সে চলে গেল? অসম্ভব! অমন ক্ষীণ সদাসন্ত্রস্ত যে, সে কেমন ক'রে এমন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে? না, কিছুতেই তাকে তিনি একলা যেতে দেবেন না, তার সঙ্গে যেতে হবে, পাশে পাশে থেকে হাত ধ'রে তাকে সাহস দিতে হবে। ছোট বোনকে লোকেরা তুলে নিয়ে চলে গেল, আপন বলতে আর কিছুই রইল না, কেবল

নিজের আহত, রক্তাক্ত হৃদয় ছাড়া। বিমূঢ়, ক্লান্ত হয়ে বড় বোন, এক কোনায় গিয়ে দেহ এলিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ বুজে গেল, নানারকম ছবি ভেসে যেতে লাগল তাঁর মনের ভিতর দিয়ে—ছোট্ট এক বোন মায়ের পাশে কী অসহায় ভাবে শুয়ে আছে!—বিয়ের কনে, কী সুন্দর, শিশুর মতন আশ্চর্য লাবণ্য মাখানো তার মুখে!—এক মাতৃমূর্তি—তার চারদিকে শিশুরা খেলা করছে—দুর্বল, ক্ষীণ এক বৃদ্ধা—তারপর, তারপর এক মূর্তি, তার আদরের বোনের মতোই দেখতে, অথচ একেবারে অন্য রকম, পাণ্ডুর মুখে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, যেন তার দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু না, সে মরেনি, সব ভুল, ঐ তো সে হাতছানি দিয়ে বোনকে ডাকছে, বলছে: বড় ভয়, এসো আমার হাত ধ'রে এই নদীটুকু আমায় পার ক'রে দাও। আশ্চর্য শান্ত একটি স্নেহের হাসি বড় বোনের মুখে ফুটে উঠল, বোনের হাতের দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন তাকে উপরে পৌঁছে দেবার জন্যে।

তাই তাঁর দেহকে যখন সবাই আবিষ্কার করল তখনো তাঁর মুখে জেগে রয়েছে এক আশ্চর্য শান্ত আর প্রসন্ন দৃষ্টি। কিসের এই শান্তি?—মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিচ্ছেদের পরেই প্রিয় বোনের সঙ্গে মিলিত হবার, পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত, এমন কি তার পরেও তার হাত ধ'রে চলার পরম শান্তি। সমগ্র জীবন তিনি এই বোনকে উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর কী সাধ্য যে তাঁকে তার কাছ থেকে দূরে রাখে!

স্মৃতিগুচ্ছ

কোনো কবি বলেছিলেন, '*Memories are like roses in December*'। সত্যিই স্মৃতি বড় মধুর লাগে যখন একাকী হৃদয়ের কাছে স্মৃতি এনে দেয় তার সৌরভ। কিন্তু সব স্মৃতিই তো আর মধুর নয়। কোনো স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিষণ্ণতা, কোনো স্মৃতির সঙ্গে আসে ক্ষোভ, আবার এমনও স্মৃতি আছে যার বেদনা সময় বা পরিবেশ কিছুতেই মুছে নিতে পারে না, লাঘব করতেও পারে না কোনোদিন। রৌদ্রোজ্জ্বল, আনন্দমুখর স্মৃতি থাকে, আবার এমন দিনের স্মৃতিও থাকে, যখন জীবনের সূর্য কালো মেঘে ঢাকা, যখন মনে হয়েছে গোটা জীবনটাই বুঝি আমার ব্যর্থ। তবু সবই তো অতীত হয়ে যায় কালের নিয়মে—কোনো স্মৃতির হয়তো অল্পমাত্র রেশ থেকে যায়, কোনো স্মৃতি হয়তো অনির্বাণ জ্বলতে থাকে বুকের মধ্যে।

তাই আমার এই বাল্যের আবাসে যখনই ফিরে যাই তখনই চারদিক থেকে স্মৃতির দল আমার মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসে, শৈশবের যত আশ্চর্য আনন্দের স্মৃতি, বয়সকালের বিষণ্ণ স্মৃতি, যে-সব দিন চলে গেছে, আবার যাদের ফিরে পাওয়া যাবে না, যায় না, সেই সব দিনের স্মৃতি। স্মৃতির ভারে মূক হৃদয় যেন বিষণ্ণতায় ভেঙে পড়তে চায়। সেই পুরনো বাড়ি আর নেই, ঘুরে ঘুরে যতবার সেখানে ফিরি, কোনো না কোনো রকমে সে বদলে গেছে।

কতদিনের চেনা সাবেকী বাগানের এক কোনায় গিয়ে বসলাম। নিরন্তর পরিবর্তনশীল জগতে এই একটি জায়গা যেখানে কোনো

পরিবর্তনের ছোঁয়াচ লাগেনি। আমার সামনে সেই চিরপরিচিত বাড়ি অপূর্ব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে মন কোথায় চলে গেল, বই নিয়ে বসেছিলাম, সে-বই কোলেই পড়ে রইল অনাদৃত হয়ে। চারদিকে অগণ্য সুন্দর প্রজাপতিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘাসের তাজা গন্ধ ভারি স্নিগ্ধ লাগছে, গোলাপের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি শুয়ে পড়লাম, চারদিক এত শান্ত, এত সুন্দর, তবু বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যথা টন্‌টন্‌ করতে থাকে, কেন ভালো বুঝতে পারি না, যেন নাগালের বাইরে কোনো কিছুর জন্যে, কি যেন হারিয়ে গেছে, আর তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না।···এই ভাবে অসংলগ্ন চিন্তায় গা ভাসিয়ে যেতে যেতে কখন ঘুমে এলিয়ে পড়লাম জানি না, অতীত স্মৃতি ছবি হয়ে ভেসে ভেসে আসতে লাগল মনের মধ্যে।

বিরাট এক চকমিলান বাড়ি চোখের সামনে ভেসে উঠল—বিরাট, পুরনো বাড়ি, বহু বারান্দা, বহু মহল তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ঐশ্বর্যের অবধি নেই—অর্থে ও সুরুচিতে মিলে যা-কিছু দিতে পারে সবই রয়েছে। গৃহকর্তার সুপুরুষ চেহারায় আর বিরাট ব্যক্তিত্বে সমস্ত বাড়িটা যেন ভরে রয়েছে, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর খুশিতে যেন সমস্ত পরিবারকে আবৃত ক'রে রেখেছে। অভ্রভেদী পাহাড়ের মতন দাঁড়িয়ে থেকে তিনি নিজের প্রিয় পরিবার-পরিজনকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে, সমস্ত ক্ষতি থেকে আগ্‌লিয়ে রেখেছেন। বাড়ির কর্ত্রী সর্বক্ষণ ঘুরঘুর ক'রে সকলের সুখদুঃখের তদারক ক'রে বেড়াচ্ছেন—আশ্চর্য তাঁর রূপ, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কিন্তু এত হাল্‌কা আর ছোট্ট দেখতে তিনি, যে কি ক'রে তাঁর মধ্যে অত অবিশ্রাম কাজের ক্ষমতা

থাকতে পারে ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। চারদিকে প্রাণের আর কর্মের মেলা, শান্তি আর প্রসন্নতার আবহাওয়া। এই আবহাওয়ার মধ্যেই বাড়ির তিনটি ছেলেমেয়ের জীবন গড়ে উঠেছিল।

কয়েক বছর পরের কথা। বাড়িটি যেমন ছিল তেমনিই আছে, কিন্তু তার থেকে মুছে গেছে সমস্ত ঐশ্বর্যের, জাঁকজমকের চিহ্ন। আগেকার রাজোচিত আড়ম্বরের স্থানে এসেছে একটি সহজ নিরাভরণ সৌন্দর্য। কিন্তু গৃহের অধিবাসীরা সেই আগের মতোই আছে, এখনও গৃহকর্তার প্রাণখোলা হাসি সমস্ত বাড়িতে ধ্বনিত হচ্ছে, বিষণ্ণ যে তার চিত্তকেও ভরে তুলছে। কারণ, যে-পরিবর্তন এসেছে সে অনটনের নয়, সে এসেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, নতুন রাজনৈতিক চারিত্র থেকে।

আরো কয়েক বছর কেটে গেল। পুরনো বাড়ির পাশে ছোট একটি নতুন বাড়ি গজিয়ে উঠেছে। আদরের ছেলের জন্য ভালোবেসে তার বাবা বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু নতুন বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে নতুন আনন্দ এল না, দুঃখই যেন বাসা বাঁধল।

এই বাড়িরই একটি প্রশস্ত ঘরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন, মাথার সমস্ত চুল শাদা হয়ে গেছে, চিন্তায় মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে শত শত মাইল পার হয়ে তিনি এসেছেন তাঁর বড় আদরের ছেলেকে দেখতে, কারণ আজ তাকে নিয়ে যাবে জেলখানায়, তার রাজনীতি সরকারের পছন্দসই নয়। বৃদ্ধ নিজেও তাঁর মতামতের জন্য অনেকদিন কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকারে, আবার যদি সেখানে যেতে হয়, তার জন্যও তাঁর মন প্রস্তুত। একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি পৌঁছলেন, তবু তো চোখের দেখাটুকু হল, একবার ছেলের হাতে

নিজের হাত রাখলেন নিয়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে। কাছেই বসেছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী, আয়তনে তিনি চিরকাল ক্ষীণ ছিলেন, কিন্তু সারা জীবনের সংগ্রামে হাসিমুখে পাশে এসে দাঁড়াতে তাঁর কখনো ভুল হয়নি, বুক কাঁপেনি। ভারি ক্ষীণ আর ছোট্ট দেখাচ্ছিল তাঁকে, যেন আগের চেয়েও ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁর অসমসাহসিক, শক্তিমান স্বামীকে তিনিই প্রতি আঘাতের সম্মুখীন হতে সাহস দিয়ে এসেছেন চিরকাল।

বাড়ির এক কোনায় বসেছিলেন বাড়ির বড় মেয়ে। তিনি তখন বিবাহিতা, ছেলেমেয়ের মা, বাবা-মায়ের বেদনাকে তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করছিলেন। তাঁর দৃষ্টি বাবা-মায়ের মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল, তাঁদের নীরব বেদনাকে অনুভব ক'রে অথচ কিছু না করতে পেরে বুক ভেঙে যাচ্ছিল। ঐ ঘরেরই আরেক দিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির ছোট মেয়ে। তার মনেও ঐ একই বেদনার ভার, কিন্তু চোখে জল নেই, চিন্তা বিদ্রোহী হয়ে জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। আর সকলের মুখে একটা নীরব আত্মসমর্পণের ভাব, যেন বিধিলিপি যা তা তো ঘটবেই—কিন্তু তার মন একান্ত অসহিষ্ণু। এক এক মুহূর্তে অবশ্য মনে হচ্ছিল দুঃখ তো তাদের পাওনাই, কারণ তাদের সংগ্রাম যে মহৎ সংগ্রাম। কিন্তু পরমুহূর্তে যখনই বাবা-মায়ের মুখের দিকে চোখ পড়ছিল, তাঁদের দুশ্চিন্তার কথা মনে হচ্ছিল, তখনই সন্দেহ আশঙ্কায় মন আকুল হয়ে উঠছিল। আরামের গদিতে ব'সে রাজার হালে দিন কাটাতে পারত যারা তারাই পা বাড়াল কর্তব্যের দুর্গম পথে, মানুষের আর দেশের সেবার পথে। বিরুদ্ধ চিন্তার ঝাপটায় দোলায়িত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, সাহস অবধি

হল না যে, বাবা-মায়ের বেদনার্ত্ত মুখের দিকে তাকায়, কারণ সেই বেদনা সাধর করবার শক্তি তার কোথায়? প্রিয় পুত্রের বিরহে ইট কাঠ পাথরের বাড়িটা পর্যন্ত বেদনায় মূক হয়ে রয়েছে। তবু, দুঃখের মধ্যেও দাঁড়িয়ে রয়েছে শিরদাঁড়া সোজা ক'রে, মাথা তুলে, যেন কতো গর্ব তার। সময়ের হিসাব ভুলে বাবা-মা ব'সে রইলেন, ঘুরে ঘুরে কেবলই তাঁদের মনে হচ্ছিল জেলের ছোট্ট কুঠুরির কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চারদিকের আরামের উপকরণগুলি দেখে মন ঘৃণায় ভরে যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ সবাই চুপ ক'রে বসে রইল, সকলে যে যার চিন্তায় মগ্ন, কিন্তু সকলেরই চিন্তা ঘুরছে একজনকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু বেশিক্ষণ এইভাবে চলল না—সকলের চমক ভাঙিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গৃহকর্তা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চোয়াল প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠেছে। যে-কাজ থেকে তাঁর ছেলেকে ওরা প্রতিহত করেছে সেই কাজ তো তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। তাই সাহসে বুক বেঁধে তিনি উঠে পড়লেন, ঘর থেকে চলে গেলেন মাথা উঁচু ক'রে। আর অমন ছেলের মা যিনি, তিনিই কি আর শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকতে পারেন? তিনিও সাহসের হাসি হেসে উঠে পড়লেন, দৈনন্দিন কাজ তো তাঁকেও চালিয়ে যেতে হবে।

তারপরেও আরো অনেক দিন কেটে গেছে। মাইলের পর মাইল রাস্তা জুড়ে বিরাট জনতা থম্‌থম্ করছে। একজনও শুকনো চোখে দাঁড়িয়ে নেই, এমন একজনও নেই যার মনে আত্মীয়বিচ্ছেদের বেদনা সঞ্চারিত হয়নি। সবাই এসেছে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। গৃহকর্তা পরলোক গমন করেছেন। চিরকাল তাঁর সংগ্রামের মধ্যেই কেটেছিল, তাই জীবনব্যাপী সাধনার কী ফল হল দেখে যাবার জন্যে শেষ ক'দিন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পর্যন্ত লড়াই

করেছিলেন। মৃত্যুরই জিত হল। শেষকালে তো মৃত্যুই জেতে। এতকালের আনন্দমুখর বাড়ির এক কোনায় তাঁর বিধবা স্ত্রী ব'সে রইলেন, বিচ্ছেদের বেদনায় তাঁর মন একেবারে পাষাণ ক'রে দিয়েছে, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও ঝরছে না। তাঁকে দুই হাতে বেষ্টন ক'রে আছে তাঁর ছেলে, সেও তার বাবাকে গভীরভাবে ভালোবাসত, তার দুই চোখে টল্‌মল্ করছে জল। দৃঢ়চিত্ত তরুণ, সে তার মা-কে সান্ত্বনা দেবার পথ খুঁজে পেলে না, মা-ই তাকে অবিরাম সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

আরো বহুকাল কেটে গেছে। বহু পরিবর্তন এসে গেছে বাড়িতে, কিন্তু এখনো অনেক বাকি। ফটক থেকে বাড়ি পর্যন্ত যে লাল কাঁকরের রাস্তাটা এসেছে, সেটা গাড়িতে গাড়িতে ঢাকা, সমস্ত বাগানে সেপাই শান্ত্রীরা ঘোরাফেরা করছে। এত রণসজ্জা কেবল মেয়ে দুটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য। তাদের অপরাধ এই, যে তারা এতকাল কুঁড়েমি ক'রেই কাটিয়ে দেয়নি, বাপদাদার প্রদর্শিত পথে কাজ ক'রে গেছে, পরিবারের ঐতিহ্যকে ম্লান হতে দেয়নি। তাই যেমন ক'রে তাদের বাবা ও দাদাকে জেলখানার পথে পা বাড়াতে হয়েছিল, তেমনি আজ তাদেরও যেতে হবে। সসম্ভ্রমে পুলিশের কর্মচারীরা গ্রেপ্তারের পরোয়ানাটা বার ক'রে দেখালে, হাসিমুখে মেয়ে দুটি সেটা নিয়ে, সঙ্গে নেবার দু'একটি জিনিস আনবার জন্য ভিতরে চলে গেল। ঠিক তখনই তাদের মা হন্‌হন্ ক'রে পা চালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত—কী হয়েছে, এত গাড়িঘোড়া লোকজন কিসের? বড় মেয়ে মা-কে দুই হাতে বেষ্টন ক'রে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল, দুই চোখ ছাপিয়ে এল জল, ধরা গলায় ব'লে উঠলেন, তোমরা না

থাকলে একা একা···পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে ছোট্ট শরীরটি সোজা ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ালেন যেন শিকারীর সামনে আহত সিংহী এসে দাঁড়িয়েছে—এমন মেয়ে তোমরা আমার, আমার বুক ফুলে ওঠে গর্বে। একটু থেমে হাসিমুখে বললেন, আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু এত বুড়ো হইনি যে তোমরা যে-রাস্তায় যাচ্ছো সে-রাস্তায় আমিও যেতে পারবো না। এই ব'লে তিনি আরেকবার মেয়েদের জড়িয়ে ধ'রে হাত বাড়িয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ঐ ক্ষীণ শরীরের উপর দিয়ে এত ঝড় গিয়েছে যে আর সয় না। আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল, তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মেয়ে দুটিকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি চলে গেল···আবার দিন কাটতে লাগল বরাবরের মতো।

জেলখানার 'সেল'এর মধ্যে নির্মম অন্ধকার চার দেওয়ালের ঘেরায় বসে একসূত্রে বাঁধা দুটি বোন পরস্পরের ভারি কাছাকাছি এসে পড়ল, ভারি প্রিয় হয়ে উঠল। একজন আরেকজনের পিঠে পিঠ দিয়ে লোহার গরাদের ভিতর দিয়ে অপরূপ লাল আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। দূরে, জেলের পাঁচিলের বাইরে কোথাও এক অপরূপ সূর্যাস্ত হচ্ছে, আলোয় রঙিন হয়ে উঠেছে সমস্ত আকাশ। চিন্তায় বিভোর হয়ে দু'জনেই ব'সে রইল। বড় বোন ভাবতে লাগল নিজের বাড়ি, স্বামী, আর ছেলেমেয়েদের কথা, ছোট বোনের কেবল মনে হতে লাগল, বাবার সেই প্রাণখোলা, মাতিয়ে তোলা হাসি যদি আবার শুনতে পাওয়া যেত! কী সাহস, কী আশা দিত ঐ হাসির আওয়াজেই! আবার মাঝে মাঝে পেতে ইচ্ছে করত মায়ের গায়ের স্পর্শ। কোথায় দূরে ঐ একঘেয়ে প্রাণহীন বাড়িতে মা পড়ে আছেন!

দরজা নড়ে উঠল, ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠল শেকল। ঐ বুঝি কেউ

আসে ! বন্দীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে—কী হল আবার ! তারের খামটা হাতে নিয়ে প্রহরিণী দুই বোনের দিকে এগিয়ে এল। দুরু দুরু বুকে খামটা ওরা হাতে নিল। তারটা পড়ার পর দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে হাসল একটু। মা একবার মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করেছেন তার কি অন্যথা হয় কখনো ! তিনিও সরকারের অতিথি হয়েছেন সুদূর কোন গারদে। পঁয়ষট্টি বছর তাঁর বয়স অথচ কী সাহস ! আর পুলিশের লোকগুলোও কি নির্মম !

আরো কয়েক বছর কেটে গেছে। কত হাসিকান্নার ইতিহাসমুখর এই বাড়িতে আবার ভেঙে পড়েছে মানুষের ভিড়। এবার পালা এসেছে মায়ের। ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি দেহত্যাগ করেছেন পরম শান্তিতে, একটি কথা না ব'লে। সারা জীবন তাঁর উৎসর্গ করেছিলেন পরের জন্য—মৃত্যুতেও তিনি অপরের ব্যস্ততার কারণ হলেন না. শান্তমুখে তিনি শয্যায় শুয়ে রয়েছেন, অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে, বিশ্বাস হয় না যে দেহে প্রাণ নেই। রানীর মতো তাঁর অঙ্গে ফুলের সাজ। জীবনেও তিনি তো রানীর মতোই ছিলেন।

অযত্নে শ্রীহীন বাগানের মধ্যে নির্জন এক বাড়ির ছবি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। বাড়ির ভিতর একটি ঘরে বাড়ির ছেলে ব'সে আছে, দিনরাত্রি কাজ করছে, টেবিলের উপর সর্বক্ষণ ঝুঁকে রয়েছে তার মাথা। তার জীবন আরামের শয্যায় কাটেনি, ভবিষ্যতও রঙিন আবেশে ঢাকা নয়, কারণ যে-পথ সে বেছে নিয়েছে সে-পথ দুর্গম, সেখান থেকে ফেরার কোনো উপায় নেই, পিছনে চাইবার অবসর নেই। থেকে থেকে সে যখন চোখ তুলে তাকাচ্ছিল তখন তার সেই ক্লান্ত চোখে ফুটে উঠছিল গভীর বেদনার ছায়া। বড় একাকী সে, বড় নিঃসঙ্গ। অন্য

লোক এসে উপস্থিত হলেই কিন্তু সেই ছায়া মিলিয়ে যায়, হাসি ফুটে ওঠে মুখে, তার ব্যবহারের মাধুর্যে সকলের মন হার মানে। অস্বস্তিতে আমি ঘুমের মধ্যে এ-পাশ ও-পাশ ফিরতে লাগলাম, বুকের ভিতরটা যেন সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। আমার এই প্রিয় বাড়িতে বছরের পর বছর কতো পরিবর্তন এসেছে, তবু ভাবতে ভালো লাগছে যে-ভাইকে দেখতে এসেছি সে এখনো জেলের বাইরে। ভাইকে ছাড়া যে বাড়িকে বাড়িই মনে হয় না!

এমন সময় ঘুম ভাঙল। চোখ মেলেই ইচ্ছা হল ছুটে উপরে ভাইর কাছে যাই, কথা বলি। বইটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম বাড়ির দিকে। ঢুকতে ঢুকতেই টেলিফোনটা রিন্‌রিন্‌ ক'রে বেজে উঠল, তুলে নিয়ে শুনি অচেনা গলায় কে বলছে—কাল আপনার ভাইর বিচারের তারিখ, সে-কথা জানাবার জন্য ফোন করছি। আশ্চর্য হলাম, 'কাল বিচারের তারিখ?' কিসের বিচার? সত্য ঘুম থেকে উঠে কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ সব কিছু মনের মধ্যে ঝল্‌সে উঠল। উপরতলায় তো ভাই ব'সে নেই—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম মাত্র, দু'দিন আগেই তো তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে!

ক্লান্ত পায়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভাই নেই, ভাইয়ের বদলে আমার সঙ্গী হল অতীতের যত অসংখ্য স্মৃতি। তাতে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। আনন্দের স্মৃতিতে আছে বেদনা, বেদনার স্মৃতিতেও আছে আনন্দ।